মুক্তি পূজারী



আর্য্য পাব্‌লিশিং কোং
৩।১ রসা রোড—কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ
৩।১ রসা রোড, কলিকাতা।

এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্ প্রেস্
১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

—ঃ০ঃ—

নির্য্যাতীত বাঙালী বীর—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ

করকমলেষু।

হে বীর,

তরুণ বাঙলার বুকে দিনের পর দিন যে মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে তুমি সেই দুর্দ্দিনের পাথেয় অন্বেষণে বাহির হইয়াছ। হে দুর্গম কান্তারের পথিক! ঝড় ঝঞ্ঝা ও করকাপাতের ভিতর দিয়া তুমি তোমার রক্ত-কেতন বিজয় গর্ব্বে উড়াইয়া চলিয়াছ। কোন ভীরুতা বা কাপুরুষতা আজও তোমায় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

হে নিষ্ঠাবান নীরব সাধক। ভারতের মুক্তি-পূজারীদের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনার স্তবক তোমারই হাতে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি—

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৩৬।

বিনীত—
"সুরেশ"

সূচীপত্র

শিবাজী	...	১
প্রতাপাদিত্য	...	৩৯
সীতারাম রায়	...	৫৫
রাণা প্রতাপসিংহ	...	৬৭
রাণা রাজসিংহ	...	৮৩

মুক্তি পূজারী

শিবাজী

ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে শৈলমালা পরিবৃত একটী দেশ আছে। ঐ দেশের নাম মহারাষ্ট্র দেশ। উহার উত্তরে সাতপুরা পাহাড় মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; পশ্চিমে অনন্ত সমুদ্র অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া নিজ শক্তি বিকাশ করিতেছে। পূর্ব্বে বরদা নদী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত হইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া ও পার্ব্বত্য ভূভাগ অবস্থিত। এই স্থানের পরিমাণ ফল প্রায় ১০০০ বর্গ মাইল।

মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। কোথাও জলপূর্ণ পল্লী, সুন্দর জলাশয়, সুরম্য উপবন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দৃশ্য বিকাশ করিতেছে; কোথাও স্বচ্ছ সলিলা তরঙ্গিনী তরঙ্গ রঙ্গ করিয়া নৃত্য করিয়া বৃক্ষ

সমাকীর্ণ বনভূমির প্রান্তদেশে রজত মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে; কোথাও নবীন লতাসমূহ প্রফুল্ল কুসুমে সজ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্য গৌরবের পরিচয় দিতেছে; কোথাও অটল পর্ব্বত আপনার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাট পুরুষের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও বা প্রশ্রবন সমূহ সুশীতল জলদান করিয়া অরণ্যচর জীবগণের তৃষ্ণা দূর করিতেছে। প্রকৃতির এই মনোহর স্থানে ভবানীভক্ত বীরপুরুষ শিবাজীর জন্ম হয়।

সম্রাটশাহ জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলে মুসলমান সুলতানদিগের আধিপত্য ছিল। তন্মধ্যে বিজাপুরের সুলতান বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। সাহজী নামক একজন মহারাষ্ট্র বীরপুরুষ সেই সময় বিজাপুর রাজসরকারে চাকরি করিতেন। সুলতান এই মহারাষ্ট্র বীরের কার্য্য কুশলতায় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহাতে তাঁহার জায়গীর ও সৈন্য সংস্কার বর্দ্ধিত হইল; এবং তিনি রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার বীরত্বে ও কৌশলে সুলতান অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। সাহজী জিজাবাই নাম্নী একটী মহারাষ্ট্র রমণীর পাণী গ্রহণ করেন। এই রমণীব গর্ভে শাহজীর দুইটি

পুত্র জন্মে। প্রথমের নাম শাম্ভজী এবং দ্বিতীয়ের নাম শিবাজী।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে পুনার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনারী দুর্গে মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বীরকেশরী শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর নামানুসারে জিজাবাই পুত্রের নাম শিবাজী রাখিলেন, শিবাজী জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় ৩ বৎসর পরে শাহজী তুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্র রমণীর পাণী গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাতে অভিমানিনী জিজাবাই স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। এইজন্য শিবাজী প্রায় ছয় বৎসরকাল পিতার সাক্ষাৎ পান নাই। শাহজী এই অভিমানিনী রমণীর অভিমান ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া দাদাজী কোণ্ডদেব নামক একজন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে শিবাজী ও তদীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণে এবং পুনার জায়গীরের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। দাদাজী অতিশয় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শিবাজীর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

এই সময় মহারাষ্ট্রীয়গণ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। যবনদিগের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের

বীরত্ব কাহিনী ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য সকলই লুপ্ত হইয়াছিল। রথের ঘর্ঘর শব্দে অশ্বের হ্রেসা ধ্বনিতে ও অশির ঝন্ ঝন্ শব্দে আর তাঁহাদের প্রাণ তেমন নাচিয়া উঠিত না। কৃষি এবং যবনদিগের চরণ সেবাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এমন সময়ে শিবাজী আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে এক নব আশার সঞ্চার করেন।

বাল্যকাল হইতেই শিবাজীর লেখা পড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল না। লেখাপড়া অপেক্ষা তিনি বীরোচিত কার্য্যই অধিক ভাল বাসিতেন। অশ্বারোহণে, বড়শা সঞ্চালনে ও তরবারি প্রয়োগে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত। তাঁহার হৃদয়ে জাত্যাভিমান ছিল না। তাই তিনি ছোট বড় সকলের সহিতই মিশিতে পারিতেন। এবং তাঁহারাও তাহার সরলতায় ও শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিত। এই কারণে শিবাজী অতি অল্প বয়সেই একটি দলের দলপতি হইতে পারিয়াছিলেন।

দাদাজী শিবাজীকে হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই চেষ্টা সর্ব্বাংশে

সফল হইয়াছিল। বালক শিবাজী মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা শ্রবণ করিয়া বালকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিত।

বালক মনের আবেগে অনেক সময় বলিয়া ফেলিতেন আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিব। বালকের বাক্য লঙ্ঘন হয় নাই, শিবাজী বাল্যকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে তিনি তাহা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিবাজী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত নির্ভীক হৃদয়ে ও অবিচলিত চিত্তে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রভাবে প্রায় সমস্ত ভারত কম্পিত হইতেছিল; তখন দক্ষিণাপথে শিবাজীর ক্ষমতা বলে একটী স্বাধীন হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীর পুঙ্গব শিবাজীর অপূর্ব্ব বীরত্বে মোগলের বিজয়িনী শক্তি লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। বহুদিনের পর আবার হিন্দুর পবিত্র ভুমি গৌরবান্বিত হইয়াছিল। বহুদিন পরে আবার হিন্দুর গৈরিক পতাকা ভারতগগনে শোভা পাইয়াছিল।

মহারাষ্ট্র দেশে মাওয়ালী নামে একটি জাতি আছে। তাহারা অত্যন্ত সাহসী, কার্য্যপটু এবং অধ্যবসায়ী, তাহারা দেখিতে অত্যন্ত কদাকার, কিন্তু গুণগ্রাহী শিবাজী রূপ অপেক্ষা গুণের অধিক সমাদর করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—মহারাষ্ট্র দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে ইহাদের একান্ত প্রয়োজন। তাই তিনি তাহাদিগকে ঘৃণা না করিয়া স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। পাহাড়ে, পর্ব্বতে বনে এবং গিরিপথে সর্ব্বদা তাহাদের সহিত ভ্রমণ করিতেন। এই ভাবে ক্রমে শিবাজীর সহিত তাঁহাদের ভালবাসা জন্মিল। তাহারা শিবাজীকে নিজেদের দলপতি বলিয়া গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল; এবং নিজজীবন দানে তাঁহার কার্য্য উদ্ধারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তখন শিবাজী তাহাদিগকে স্বহস্তে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। শিবাজীর শিক্ষা গুণে তাহারা অতি অল্পদিনের ভিতরেই পরাক্রান্ত যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইল।

মহারাষ্ট্র দেশে বিজাপুরের সুলতানের অধিকৃত অনেকগুলি গিরি দুর্গ ছিল। শিবাজী কৌশলে নিজ-মাতয়ালী সৈন্যগণের সাহায্যে তাহার কতকগুলি অধিকার করেন। এই অধিকার লইয়া বিজাপুরের

সুলতানের সহিত শিবাজীর বিরোধ উপস্থিত হয়। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করিবার জন্য আফ্‌জালখাঁর অধিনায়কতায় বহু সৈন্য মহারাষ্ট্রে প্রেরণ করেন। আফজালখাঁ অতিশয় হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। তিনি শিবাজীকে জব্দ করিবার জন্য পথিমধ্যে গোরক্তে হিন্দুতীর্থের পবিত্রতা নষ্ট করেন ও দেবমন্দির ভঙ্গ করিবার আদেশ দেন। শিবাজী এই সময়ে রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। শীঘ্রই এই সংবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। ভবানীভক্ত শিবাজী এই সংবাদে অধীর হইয়া উঠিলেন। আফজলখাঁকে প্রতিশোধ দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া প্রতাপগড়ে যাত্রা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইল না। সুসময় উপস্থিত হইল। শিবাজী বিজাপুর সৈন্যদিগকে পরাজিত করিবার জন্য কৌশল জাল বিস্তার করিলেন।

অরণ্যময় দুর্গম গিরিপথে সৈন্য নিয়া অগ্রসর হওয়া যে কতদূর কষ্টকর তাহা আফজালখাঁ বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি শিবাজীকে কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য অবিলম্বে শিবাজীর নিকট প্রতাপগড়ে গোপীনাথ পণ্ড নামক এক মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণকে প্রেরণ

করেন। গোপীনাথ শিবাজীর সম্মুখে উপনীত হইলে পর শিবাজী নিজ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া ব্রাহ্মণকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন। তখন গোপী-নাথ শিবাজীর নিকট আফজালখাঁর আদেশ সবিস্তারে নিবেদন করিলেন। শিবাজী ও অতি বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন আমি বিজাপুর সুলতানের একজন আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। সুলতান যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে একটি জায়গীর দান করেন; তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। শিবাজীর এইরূপ সৌজন্য দেখিয়া দূত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; তারপর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে গোপীনাথ সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার আদেশে দূতের সহচরগণ কিছু দূরে অন্য এক স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। জগৎ নিস্তব্ধ। এমন সময়ে হঠাৎ গোপীনাথ কাহার পদ শব্দে জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন একজন যোদ্ধা অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া—তাঁহার শয্যার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। গোপীনাথ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার শরীর ও একেবারে দুর্ব্বল ছিল না। কিন্তু অস্ত্র ও অনুচর শূন্য। এ অবস্থায় তিনি কি করিবেন। প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু

যোদ্ধা তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে চীৎকার করিতে বারণ করিলেন। গোপীনাথ চীৎকার করিলেন না বটে, কিন্তু ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যোদ্ধা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া, গোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া নিজ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—আমি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ ও গাভী দিগকে রক্ষা করিতে, দেবমন্দির ধ্বংস কারীকে শাস্তিদিতে, এবং স্বধর্ম্ম বিরোধী শত্রু-গণকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ, আমার কার্য্যে সাহায্য করা আপনার একান্ত প্রয়োজন। আমি আশা করি আপনাদের মত ব্রাহ্মণগণের সাহায্য পাইলে স্বদেশীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।• শিবাজী এই কথাগুলি গম্ভীর ভাবে বলিয়া গোপীনাথকে একখানি গ্রাম পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোপীনাথ এই তরুণ বয়স্ক হিন্দুবীরের অসীম সাহস, দেব দ্বিজে অকৃত্রিম ভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া শিবাজীর বিরুদ্ধে আর কোন কথা বহির্গত হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন

জীবিত থাকিবেন ততদিন শিবাজীর আদেশ পালন করিবেন। বলা বাহুল্য সেই দিন হইতেই গোপীনাথ শিবাজীর চিরসহচরের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

গোপীনাথকে শিবাজীর নিকট পাঠাইয়া আফজাল খাঁ মনে করিয়াছিলেন যে শিবাজী এখনই আসিয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। দিন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। শিবাজী তো দূরের কথা প্রেরিত দূতও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। আফজাল খাঁ সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন শিবাজী প্রেরিত দূত কৃষ্ণাজী ভাফর নানাবিধ উপঢৌকন সহ গোপীনাথের সহিত শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণাজী ভাস্কর বিজাপুরের সেনানায়কের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—শিবাজী তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনে স্বীকৃত আছেন। বিজাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধাচরণে তাঁহার ইচ্ছা নাই। আফজাল খাঁ নিশ্চিন্ত হইলেন। গোপীনাথের পরামর্শে তিনি শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

স্থান নির্দ্ধারিত হইল। শিবাজী আফজাল খাঁর আগমনের জন্য জঙ্গল কাটাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল পূর্ব্ববৎই রাহয়া গেল। শিবাজী এই জঙ্গলের ভিতর নিজ মাওয়ালা সৈন্য লুক্কায়িত করিলেন। বিজাপুরের সৈন্যগণ ইহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ১৫০০ পোনর শত সৈন্য সমভিব্যাহারে আফজাল খাঁ শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। পথিমধ্যে গোপীনাথের পরামর্শে ঐ সকল সৈন্য প্রতাপ-গড় দুর্গের কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া একাকী একজন অনুচর সহ শিবাজীর সহিত সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া সেইস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার দেহ লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল। ঐ বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্র নখ সন্নিবেশিত ছিল। অপরে ইহা জানিতে না পারে এই জন্য তিনি বর্ম্মের উপরে পরিষ্কৃত কার্পাশ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। আফজাল খাঁকে আসিতে দেখিয়া শিবাজী যথোচিত নম্রতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফজাল খাঁর নিকটবর্ত্তী হইলেন। আফজাল খাঁর ন্যায় তাঁহার সঙ্গেও একজন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। হঠাৎ আফজাল খাঁ "ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক" "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গন সময়ে শিবাজী তাঁহার উদরে ব্যাঘ্রনখ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আফজাল খাঁ তাঁহার কোষস্থিত অসি দ্বারা শিবাজীকে আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবাজীর তাহাতে কিছুই ক্ষতি হইল না। কারণ তাঁহার দেহ লৌহবর্ম্মে আবৃত ছিল। অসি বর্ম্মে ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শিবাজী অস্ত্র চালনা করিয়া আফজাল খাঁকে নিরস্ত্র করিয়া ফেলিলেন। প্রভুভক্ত অনুচর এই আকস্মিক বিপদে স্থির থাকিতে পারিল না। সে অসীম সাহসের সহিত প্রভুহন্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে অনুচর যে বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বর্ণনাতীত, স্বয়ং শিবাজী পর্য্যন্ত তাহার এই বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেও অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পতন হইল। পাল্কী বাহকগণ অবস্থা গুরুতর বুঝিতে পারিয়া প্রভুকে লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। শিবাজীর কয়েকজন সৈনিক ইতিমধ্যে উপস্থিত হইয়া আফজাল খাঁর শিরশ্ছেদ করিল। সঙ্গে সঙ্গে পতঙ্গ শ্রেণীর মত অগণিত সৈন্য অরণ্য হইতে

বহির্গত হইয়া বিজাপুর সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষ-গণ ইহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা মাওয়ালী সৈন্যের অসির আঘাতে বাতাহত কদলী বৃক্ষের মত রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। শিবাজী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রণডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবাজীর উৎসাহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নানা দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আবার অনেক বীরপুরুষ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিল। শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী অধিকতর দুরূহ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান কোকন নামে পরিচিত এই স্থানের পাস্‌হালা দুর্গ অতিশয় সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। শিবাজী এই দুর্গ অধিকার কালে যেরূপ বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই কল্পনাতীত, তিনি তাঁহার কতিপয় সেনাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া ছলপূর্ব্বক তাহাদের সহিত ঝগড়া করেন। ইহাতে তাঁহার সেনাপতিগণ বিরক্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, দুর্গাধিপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্গাধিপতি

তাহাদের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। শিবাজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তিনি নৈশ অন্ধকারে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দুর্গ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। শিবাজী সহজেই দুর্গ অধিকার করিলেন। বিজাপুরের সুলতান তাহার এই জয় লাভে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তিনি একজন আবিসিনীর সর্দ্দারকে প্রেরণ করেন। আবিসিনীর সর্দ্দার নিজ সৈন্যগণকে পান্‌হালা দুর্গ অবরোধ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু এবারেও বিজয়লক্ষ্মী শিবাজীর অঙ্কশায়িনী হইলেন। তাঁহার বুদ্ধি কৌশলে আবিসিনীর সর্দ্দার নিজ অনুচরগণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন।

পান্‌হাল দুর্গ স্বাধিকারে আনিয়া শিবাজী নিজ সৈন্যগণকে বিজাপুর রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আদেশ দেন, সৈন্যগণ প্রভুর আদেশে উন্মত্ত হইয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে বিজাপুর নগর প্রাচীরের সমীপবর্ত্তী হইল, পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া বিজাপুরের সুলতান নিরাশ হইয়া পরিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন শিবাজীকে দমন করিবার মত শক্তি তাঁহার আর নাই, কাজেই ওমরাহগণের পরামর্শ মতে শিবাজীর সহিত সন্ধি করাই স্থির

হইল। শিবাজী কখনও নিজে অগ্রবর্ত্তী হইয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন নাই।

বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করতঃ ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করিয়া আওরঙ্গজেব দীল্লির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অত্যাচারে ভারতভূমী জর্জ্জরিত হইয়াছে। হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পবিত্র দেব-মন্দির গোরক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। কে তাহার কার্য্যে বাধা প্রদান করিবে। কে অগ্রসর হইয়া হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। এ চিন্তায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে দুইজন বীরপুরুষের আবির্ভাব হইল। যাঁহাদের দৈবশক্তির নিকট মোগলের পাশবিক শক্তি প্রতিহত হইল। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পাইল। তাঁহাদের একজন রাণা রাজসিংহ, অপর মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী।

বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যখন আওরঙ্গজেব আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অনুচর প্রেরণ করিয়া শিবাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃভক্ত শিবাজী আওরঙ্গজেবের এই অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার এইরূপ হীনতার কথা শ্রবণ করিয়া অবজ্ঞাভরে দূতকে

বিদায় দেন, এবং আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত পত্র ঘৃণার সহিত কুক্কুরের লেজে বাঁধিয়া দিতে আদেশ দেন। সেই অবধিই শিবাজীর উপর আওরঙ্গজেবের বিদ্বেষ ভাব সঞ্চার হয়, এবং সেই অবধিই শিবাজী আওরঙ্গজেবকে পার্ব্বত্য মূষিক বলিয়া ঘৃণা করিতেন ও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সর্ব্বদা রত থাকিতেন।

শিবাজীও নীরবে এই অপমান সহ্য করিলেন না। তিনি ও বিজাপুরের সুলতানের সহিত সন্ধি করিয়া মোগল রাজ্য—আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি নিজ সৈন্যগণকে মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাহারা সম্রাটের অধিকার লুণ্ঠন করিয়া পুনায় প্রত্যাগমন করিল। ক্রমে এই সংবাদ সম্রাট আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য যশোবন্ত সিংহ ও শায়েস্তা খাঁর অধিনায়কতায় এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিবাজী ইহাতে ভীত হইলেন না বটে, কিন্তু সন্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। চতুর শিবাজী চতুরতায় ও কৌশলে মোগলদিগের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন।

আওরঙ্গজেবের আদেশ ক্রমে শায়েস্তা খাঁ বহু

সৈন্যসহ পুনায় আগমন করিলেন। শিবাজী মোগল সৈন্যের আগমন শ্রবণ করিয়া রায়গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ পূর্ব্ব হইতেই শিবাজীর বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি আসিয়াই অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় পুনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু এত সতর্কতায়ও কোন ফল লাভ হইল না। শিবাজীর চতুরতার নিকট শায়েস্তা খাঁর চতুরতা নিষ্ফল হইল।

শিবাজীকে দমন করিবার জন্য যখন আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক শায়েস্তা খাঁ প্রেরিত হন, তখন তিনি আওরঙ্গজেব সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—শিবাজী বাল্যকালে পুনায় যে গৃহে বাস করিতেন, তিনি সেই গৃহে বসিয়া কোরাণ পাঠ করিবেন। আওরঙ্গজেব; মাতুল সায়েস্তা খাঁর এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন—"মাতুল, আপনি যদি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে বাঙ্গলার সুবেদারী প্রদান করিব।"

পঙ্গপালের মত অসংখ্য মোগল আসিয়া পুনা অধিকার করিয়া বসিল। সায়েস্তা খাঁ স্বীয় প্রতিজ্ঞার কথা

স্মরণ করিয়া, যে গৃহে শিবাজী বাস করিতেন, সেই গৃহে নিজবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। গোরক্তে সেই পবিত্র গৃহ কলুষিত করিলেন। তৎপর শায়েস্তা খাঁ স্বয়ং সেই গৃহে কোরাণ পাঠ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

শায়েস্তা খাঁর এই অন্যায় আচরণ শিবাজীর কর্ণ-গোচর হইল। যে গৃহে তিনি মাতার সহিত পবিত্র কৈশোরকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, যে গৃহে বসিয়া তিনি বৃদ্ধ দাদাজির নিকটে পবিত্র রামায়ন ও মহা-ভারতের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, যে গৃহে থাকিয়া তাঁহার জননী নানারূপ যাগ যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়াছেন; আজ সেই পবিত্র গৃহ যবন অত্যাচারে কলুষিত, শিবাজী খুবই মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে প্রকারেই হউক স্বীয় বাস গৃহ শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

অন্ধকার রাত্রি! কোথাও জন সমাগম নাই। সমস্ত পুণানগরী নিস্তব্ধ। কেবল একদল বিবাহযাত্রী সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুণার রাজপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। সাহসী শিবাজী মাত্র ২৫ জন অনুচরসহ এই বিবাহযাত্রীদলে মিশিলেন। এবং তাহাদের সঙ্গে চলিতে চলিতে একেবারে স্বীয়বাস ভবনে পঁহুছিলেন। এই

গৃহে শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের কয়েকজন স্ত্রীলোক এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া দিল। শায়েস্তা খাঁ শয়ন গৃহের গবাক্ষ দিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন। আক্রমণ-কারিগণের তরবারি আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক তিনি কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। তাঁহার পুত্র ও অনুচরবর্গ নিহত হইল। শিবাজী "হর হর" রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া সিংহগড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপরদিবস কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সৈন্য শিবাজীর সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। শিবাজীও চুপ করিয়া রহিলেন না। তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। মহারাষ্ট্রীয়গণের অসির আঘাতে অনেক যবন সৈন্য অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। অবশিষ্টগণ বিজয়ে নিরাশ হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। শিবাজীর সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে সিংহগড়ে প্রত্যাগমন করিল।

সমগ্র মহারাষ্ট্রে শিবাজীর এই বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইল, সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসী মহাবীরের এই অপূর্ব্ব বীরত্বে

মোহিত হইয়া তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল। বহুশত বৎসর অতীত হইয়াছে, বহুরাজ্য ধ্বংশ হইয়াছে, কিন্তু শিবাজীর ঐ সাহস ও বীরত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। আজিও মহারাষ্ট্রীয়গণ গৌরবের সহিত সকলের নিকট এই মহাবীরের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকে।

মোগলদিগের পরাজয়ে শিবাজীর সাহস ও শক্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তিনি নিজ অশ্বারোহী সৈন্য গণের সাহায্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধিকৃত স্থরাট-নগর লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগে শিবাজী সিংহগড়ে শয়ন করিয়া অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন।

একে শায়েস্তাখাঁর পরাজয় তার উপর আবার শিবাজী কর্ত্তৃক পবিত্র স্থরাট বন্দর লুণ্ঠন, আওরঙ্গজেব এই সংবাদে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তিনি শিবাজীকে দমন করিবার জন্য অম্বরাধিপতি জয়সিংহ ও দিলিরখাঁকে প্রেরণ করিলেন। অম্বরাধিপতির বীরত্ব অতুলনীয়, তৎকালে যে সকল সেনাপতি মোগলদিগের অধীনে চাকুরী করিতেন; তন্মধ্যে জয়সিংহ শ্রেষ্ঠতম। তাঁহার নামে তাঁহার প্রতাপে সমগ্র ভারত কম্পিত হইত।

এমন কি স্বয়ং সম্রাট পর্য্যন্ত এই বীরপুরুষকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন, রাজা জয়সিংহ রাজপুত। মোগলদিগের অধীনে চাকুরী করিলেও তিনি মোগলদিগের মত বিলাসী ছিলেন না। দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াই তিনি প্রবল-বেগে শিবাজীকে আক্রমণ করিলেন। শিবাজী এই আক্রমণের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইতে লাগিল, দুর্গের পর দুর্গ মোগলদিগের হস্তগত হইতে লাগিল।

শিবাজী মহাবিপদে পতিত হইলেন। তিনি কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। একদিকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা, অপর দিকে দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা স্বীকার। এখন কোন্‌টি অবলম্বনীয়? স্বদেশের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ হওয়া মাত্র বীরবরের চক্ষু দিয়া অজস্র ধারা প্রবাহিত হইল। বাল্যকালে ও কৈশোরে তিনি যে স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন—আজ কিরূপে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন। আর এই জন্য কি ভগবান তাঁহাকে এমন ভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এখনও মহারাষ্ট্রে পুরুষ আছে, এখন ও মহারাষ্ট্রীয়গণ দেশের স্বাধীনতা

রক্ষার্থে হৃদয় রক্তদানে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু হৃদয় রক্ত দানে ও যে আর স্বাধীনতা রক্ষা হয় না।

অনেক চিন্তার পর মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই তিনি সঙ্গত মনে করিলেন। তদনুসারে অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া তিনি জননীর সহিত মন্ত্রণাগারে গমন করিলেন। একে একে তানাজী, মোরো পন্থ, নাঁপলোপন্থ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া মন্ত্রণাগারে প্রবেশ করিলেন। সকলের বদনই বিষণ্ণ। কাহারও মুখ দিয়া কোনরূপ কথা বহির্গত হইতেছে না। অবশেষে স্বয়ং শিবাজী মাতৃপদ বন্দনা করিয়া অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"বন্ধুগণ! আজ আমাদের কি বিপদ উপস্থিত তাহা তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছ। এখন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার জন্যই আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি রাজা জয়সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিব। মহারাষ্ট্রীয়গণের যতক্ষণ শক্তি ছিল, ততক্ষণ তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে। এখন অস্ত্রাগার অস্ত্র শূন্য রাজকোশ অর্থ শূন্য। আর কিরূপে যুদ্ধ চলিবে? শুধু প্রজাক্ষয় করিয়াই বা লাভ কি? যদি আবার সুদিন ফিরিয়া আসে, যদি ভগবতী ভারতী আবার

সুপ্রসন্ন হন, তাহা হইলে সব হইবে।" সকলেই শিবাজীর কথায় মত দিলেন। তখন সকলে এক মত হইয়া রঘুনাথপন্থ ন্যায় শাস্ত্রীকে জয়সিংহ সকাশে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের সহিত দূতের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। দূত বিদায় লইয়া শিবাজী সমীপে আগমন করিলেন।

বীর ধর্ম্মের পক্ষপাতী শিবাজী কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অত্যল্প অনুচরসহ বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।

জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া অনিবার জন্য একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। শিবাজী শিবির দ্বারে উপস্থিত হইলে, স্বয়ং জয়সিংহ আসন হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপন আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত ও দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট ইহা অনুমোদন করিয়া জয়সিংহ সমীপে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর শিবাজী মোগলের পক্ষ হইয়া বিজাপুরের সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; এবং তৎপর বৎসর সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহুত হন। শিবাজী এ বিষয়ে জয়সিংহ সকাশে পরামর্শ চাহিল, জয়সিংহ তাহাকে সেখানে যাইবার পরামর্শ দেন।

শিবাজী তদনুসারে আপন পুত্র শম্ভূজী, পাঁচশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র মাবলী সৈন্যের সহিত আগ্রায় যাত্রা করিলেন।

শিবাজী আগ্রায় উপস্থিত হইলেন। আগ্রার অধিবাসীবৃন্দ এই বীরপুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু হিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেব ঈর্ষাপ্রযুক্ত এই বীরপুরুষের যথোচিত সম্মান করিলেন না। সভাগৃহে নীত হইলে পর সম্রাট তাঁহাকে নিম্ন শ্রেণীর আসনে বসিবার আদেশ প্রদান করেন। তেজস্বী বীরপুরুষ ইহাতে নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু আগ্রা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বাসগৃহে বন্দী হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী আওরঙ্গজেবের এই হীন আচরণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু কোনরূপ অশিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন না করিয়া অনুচর বর্গের সহিত মুক্তি পাইবার জন্য চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি সম্রাট সমীপে এই মর্ম্মে আবেদন করিলেন যে, আগ্রার জল বায়ু তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না। অতএব সম্রাট অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বদেশে চলিয়া যাইবার অনুমতিদানে কৃতার্থ করিবেন। সম্রাট ও তাহাই

চান। সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে শিবাজী সহজেই তাঁহার আয়ত্ব হইবে এই মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ আবেদনপত্র মঞ্জুর করিলেন। সম্রাটের আদেশে শিবাজীর অনুচরবর্গ সকলেই স্বদেশে গমন করিলে পর, সম্রাটকে জব্দ করিবার জন্য শিবাজী আর এক চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি পীড়ার ভান করিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। অনন্তর পীড়ায় কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিয়া ঝুড়িতে মিষ্টান্ন রাখিয়া ফকির সন্ন্যাসীর সেবার জন্য তাহা নানাস্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার বাসগৃহ হইতে মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ি নানা স্থানে প্রেরিত হইতে লাগিল। যখন প্রহরীদের বিশ্বাস হইল যে, কেবল মিষ্টান্নই নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে, তখন শিবাজী স্বয়ং এক ঝুড়িতে বসিয়া ও পুত্রকে অন্য এক ঝুড়িতে বসাইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবাজী ও তাঁহার পুত্র সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে মথুরায় রাখিয়া শিবাজী সন্ন্যাসীর বেশে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে স্বীয় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। ইত্যবসরে তাঁহার আত্মীয়বর্গ ও শম্ভূজীকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল।

শিবাজীর আগমনে মহারাষ্ট্রদেশে নানারূপ উৎসব আরম্ভ হইল। নবীন ভূপতির মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণগণ মন্দিরে মন্দিরে বেদপাঠ ও যাগযজ্ঞাদি আরম্ভ করিলেন। যুবক কর্ম্মিগণ মনের আনন্দে কর্ম্মী সঙ্ঘ গঠন করিয়া তাঁহার সৈন্যদল পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ধনিগণ নিজ নিজ অর্থরাশি দান করিয়া তাঁহার ধনাগার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। আর রাজ জননী জিজাবাই পুত্রের দীর্ঘ-জীবন কামনায় দীনদরিদ্রকে মনের আনন্দে অর্থ, বস্ত্র ও অন্নদানে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। চারিদিকেই আনন্দ, চারিদিকেই নবীন ভূপতির জয়গান।

শিবাজী রায়গড়ে পৌঁছিয়াই বিপুল সমরায়োজনের আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। সহস্র সহস্র সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রায়গড়ে রাজ-পতাকার দলে দণ্ডায়মান হইল। শিবাজী ইহাদিগকে লইয়া প্রবলবেগে মোগল সৈন্যের উপর পতিত হইলেন। মোগলগণ প্রমাদ গণিল। তাঁহারা শিবাজীর এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। মহারাষ্ট্র-গণের অসির আঘাতে অসংখ্য মোগলসৈন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। যুদ্ধের বিরাম নাই। অবিরত যুদ্ধ চলিতেছে। মোগলগণ ব্যতিব্যস্ত

হইয়া উঠিল। খাবার সময় নাই, নিদ্রার সময় নাই।

শিবাজী যেখানে সেখানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া নিতেছে। এক শিবাজী শত শিবাজীতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা যেখানে যায়, সেখানেই শিবাজীর গর্জ্জন ও হুঙ্কার শুনিতে পায়। এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে শিবাজী সিংহগড় ও অন্যান্য কতিপয় দুর্গ ব্যতীত সকল স্থান অধিকারে সমর্থ হইলেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার স্বাধীনতা স্থায়ী হইল। শিবাজীর জয় ধ্বনিতে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশ মুখরিত হইল।

পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবাজীর সাহস ও শক্তি অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি আর এখন সাধারণ জায়গীর-দার নহেন। তিনি এখন মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্বাধীন ভূপতি। তাঁহার অধীনে বিপুল সৈন্য। দাক্ষিণাত্যে তাঁহার মত বীর পুরুষ আর কেহই নাই। তথাপি সিংহগড় মোগল অধিকৃত, এ চিন্তায় শিবাজী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারেই হউক সিংহগড় অধিকার করিতে হইবে। কিন্তু সিংহগড় অধিকার করা অতি দুরূহ কার্য্য। একে উহা দুরারোহ

পর্ব্বতোপরি অবস্থিত, তদোপরি আবার রাজা জয়সিংহ নিয়োজিত উদেভান বহুসংখ্যক মোগল পাঠান ও রাজপুত সৈন্যসহ উহা রক্ষা করিতেছেন। সেনাপতি উদেভান রাজপুত বংশোদ্ভব। তিনি পরাক্রমে অপরাজেয়। তাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা দাক্ষিণাত্যে খুব কমই ছিল। এই অবস্থায় কিরূপে তিনি উহা অধিকার করিবেন; তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ চিন্তারপর নিজ সাহসী অনুচরগণকে আহ্বান করিলেন,শিবাজীর আদেশে অনুচরগণ সকলেই একত্র সমবেত হইলেন। তখন শিবাজী তাহাদের সম্মুখে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

মহারাজ শিবাজীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই নিস্তব্ধ হইলেন। কাহারও মুখ দিয়া কোনরূপ কথা বহির্গত হইল না। একে অন্যের মুখ অবলোকন করিতে লাগিলেন। বীর কেশরী শিবাজী স্বীয় অনুচরগণের এইরূপ আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল; হস্তপদ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ কেশরীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। অনুচরগণ এখন কি করিবেন স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিলেন। এমন সময় তানাজী স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া বলিলেন—

"এ দাস এ ভার বহনে স্বীকৃত আছে।" অনুমতি হইলে এ দাস সিংহগড় অধিকারে নিজজীবন দানে কুণ্ঠিত হইবে না। তানাজীর এইরূপ বীরোচিত উত্তরে শিবাজী অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। মেঘশূন্য আকাশের মত তাঁহার বদন নির্ম্মল হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তিনি তানাজীকে আলিঙ্গন দিলেন।

সিংহগড় নৈসর্গিক রাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। একদিকে সহ্যাদ্রি অনন্তগগণে মাথা তুলিয়া অপূর্ব্ব গাম্ভার্য্যের পরিচয় দিতেছে। সহ্যাদ্রির পূর্ব্বপ্রান্তে সিংহগড় উত্তর দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বত। এই পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধমাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও এইরূপ দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বত বিস্তৃত রহিয়াছে। দুর্গটি ত্রিকোণাকার। তানাজী অদ্য এই ভীষণ দুর্গ অধিকারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

অন্ধকার রাত্রি। মাঘ মাসের দুরন্ত শীতে মানবগণ গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। পার্ব্বত্যপথ সকল শিশির পাতে অত্যন্ত পিছিল হইয়াছে। প্রতি পাদক্ষেপে পদস্খলনের সম্ভাবনা। সাহসী তানাজী এমন

সময় এক সহস্র মাওয়ালা সৈন্যসহ সেই দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন। কোলাহল নাই, পদশব্দ নাই, নিঃশব্দে সকলেই একে একে পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে যুদ্ধাদি কার্য্যে সংবাদ আদান প্রদান করিবার জন্য শিক্ষিত কপোত ব্যবহার হইত। বর্ত্তমান সময়েও অনেক সুসভ্যদেশে এইরূপ শিক্ষিত পশুপক্ষীর সাহায্য গ্রহণের প্রথা প্রচলন আছে। মহারাজ শিবাজী ও দুরারোহ পর্ব্বতাদিতে আরোহণ করিবার জন্য এক প্রকার শরিস্থপের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহাদের নাম গোসাপ। শিবাজীর শিক্ষা-বলে ইহারা এইরূপ শিক্ষিত হইত যে, তাহারা মানুষের মত রাজার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে স্বীকার করিত। আর মানুষের মত তাহারা মানুষের কথাবার্ত্তা ও আকার ঈঙ্গিত সবই বুঝিতে পারিত। অদ্য তানাজী এইরূপ একটি গোসাপের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। তিনি একটি দৃঢ় রজ্জু তাহার কটিদেশে বন্ধন করিয়া তাহাকে পর্ব্বত উপরে গমন করিবার আদেশ দিলেন। প্রভুভক্ত গোসাপ প্রভুর ঈঙ্গিতে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার সুতীক্ষ্নখর শীলাদেহে বদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। তানাজী সেই রজ্জু আকর্ষণ করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া সেই রজ্জু দৃঢ় ভাবে বন্ধন করিলেন। বহু সৈন্য সেই রজ্জুর সাহায্যে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিল ; ইতিমধ্যে একটি শব্দ হইল। ঐ শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষেরা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগণিত লোক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতেছে। ঘটনা কি জানিবার জন্য একজন সৈনিক সেই দিকে অগ্রসর হইলে একজন মাওয়ালী সৈন্যের নিক্ষিপ্ত তীরে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই শব্দে দুর্গস্থিত সৈনিক পুরুষগণ সকলেই সেই দিকে অগ্রসর হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। শিবাজী ভক্ত তানাজী এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তানাজী বীর শয্যায় শায়িত হইলেন। দলপতির মৃত্যুতে মাওয়ালী সৈন্যগণ রণস্থল পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যামী গম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে কহিলেন—"শিবাজীর অনুচর হইয়া তোমরা কোন মুখে পলায়ন করিতেছ। যাহারা শিবাজীর অনুচর তাহারা পলায়ন করিতে জানে না।" এইবাক্যে মাওয়ালী সৈন্যগণের উৎসাহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

তাহারা বিপুল বিক্রমে রাজপুত ও যবন সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। রাজপুত ও যবন সৈন্যগণ মহারাষ্ট্রীয়-গণের আক্রমণে অস্থির হইয়া উঠিল। মোগলের পশু শক্তি মহারাষ্ট্রীয়গণের দৈবশক্তির নিকট প্রতিহত হইল। অসংখ্য অসংখ্য রাজপুত ও যবন সৈন্যের খণ্ডিতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে স্তূপকৃত হইল। রক্তনদী প্রবাহিত হইল। মাওয়ালী সৈন্যগণ "মহারাজ শিবাজীর জয়" রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া; সিংহগড় অধিকার করিল। পরদিবস এই সংবাদ মহারাজ শিবাজীর নিকট প্রেরিত হইল। সংবাদ শ্রবণে শিবাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, সিংহগড় অধিকার হইয়াছে; আমীর সিংহ কোথায়? ১৬৬৮খৃঃ অব্দে এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই সময় শিবাজী শুনিতে পাইলেন মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব হিন্দুর পবিত্রতীর্থ কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস ও সেই স্থানের পবিত্রতা কলুষিত করিয়া-ছেন। হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক মহারাজ শিবাজীর হৃদয়ে ইহা শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, মুসল-মানদের তীর্থ-স্থান সদৃশ পবিত্র সুরাটনগর লুণ্ঠন করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিবেন। কার্য্যেও তাহাই হইল। শিবাজী প্রায় পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া

সুরাট নগরে উপস্থিত হইলেন। নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই এই মহারাষ্ট্রবীরের বিরুদ্ধাচারণে সাহসী হইলেন না। শিবাজী অবাধে সুরাট হইতে প্রচুর ধনরত্নলাভ করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। (১৬৭০)

শিবাজীর এই বিজয় সংবাদে আওরঙ্গজেব অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মহাবত খাঁর অধিনায়কতায় এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন, তাহারা সম্মুখ সমরে শিবাজীকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে মালহের দুর্গের পথ অবরোধ করিয়া রহিল। শিবাজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। আত্ম সম্মানে বিসর্জ্জন দিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় বীর ধর্ম্ম রক্ষায় যত্নশীল হইলেন। তিনি মেরোবাস্ত ও প্রতাপরাও নামক দুইজন সেনাপতিকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। ফলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠে। ঐ যুদ্ধে মোগলগণ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করেন, তাহাদের অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ২২ জন সেনানায়ক নিহত হয়েন। কয়েকজন সেনাপতি আহত হইয়া বন্দীত্ব স্বীকার করেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণের সম্মুখ সমরে এইপ্রথম জয় লাভ। তাহাদের এই বিজয় সংবাদ অবিলম্বে চারিদিকে ঘোষিত হইল। জনসাধারণ শিবাজীকে পরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সম্মান করিলেন। অপূর্ব্ব সমর কৌশলে বিস্মিত হইলেন। শিবাজী বন্দিগণের সহিত কোনরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া বীর ধর্ম্ম কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি তাহাদিগের সুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আরোগ্য হইলে পর তিনি তাহাদিগকে প্রভূত সম্মান সহকারে বিদায় দেন। শিবাজী পতিত শত্রুর প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।

এইরূপে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া শিবাজী রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে তিনি গানভট্ট নামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে রায়গড়ে আনায়ন করিয়া তাঁহার উপর অভিষেক করিবার ভার ন্যস্ত করেন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৫৯৬ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি প্রাতঃস্মরনীয়। ঐদিবস শিবাজী রায়গডে স্বাধীন ভূপতির সম্মানলাভ করেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে নানারূপ ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে,

মহোল্লাসের তরঙ্গে, রায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। স্বাধীনতা ভক্ত হিন্দুবীরগণের জয় ধ্ববনিতে রায়-গড় মুখরিত হয়। দীন দরিদ্রগণ প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন লাভ করিয়া দুইহাত তুলিয়া শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিল। রাজ্যাভিষেককালে বিভিন্ন স্থান হইতে কতিপয় দূত রায়গড়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একজন ইংরাজদূত কোম্পানির প্রতিনিধি হইয়া শিবাজীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। এইরূপে শিবাজীর অভিষেক ক্রীড়া সম্পাদিত হয়। রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া শিবাজী যথা নিয়মে রাজ্যশাসন—করিতে আরম্ভ করিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণ-নদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি এইরাজ্য শাসনে কখনও ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। যুদ্ধ জয়ে ও রাজ্য বিস্তারে তাঁহার যেরূপ কৌশল প্রকাশিত হয়, রাজ্য শাসনেও তিনি সেইরূপ কৌশলের পরিচয় দিয়া-ছিলেন। তাঁহার অধীনে প্রজাবর্গের কোনরূপ কষ্ট-ছিল না। সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করিত। রাজা স্বয়ং সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার রাজ্যে চোর দস্যুর উপদ্রব ছিল না। প্রজাগণ সকলেই নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে আপন আপন কার্য্যে রত থাকিতে পারিত।

রাজ্য তাঁহাকে দান করিয়া ত্যাগের মহিমা প্রদর্শন করেন।

শিবাজী লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার নাম লুপ্ত হয় নাই। আজিও ভারতবাসিগণ এই বীরপুরুষের নামে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। কত রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে ; কত রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন হইয়াছে, কতনগর শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু শিবাজীর নাম নষ্ট হয় নাই। যতদিন স্বাধীনতার গৌরব থাকিবে, ক্ষমতার সম্মান থাকিবে ; ততদিন এই বীর পুরুষের নাম লুপ্ত হইবে না।

প্রতাপাদিত্য

বাঙ্গালী ভীরু, বাঙ্গালী কাপুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রের নাম শুনিলে বাঙ্গালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠে ; অসীর ঝন্ ঝন্ শব্দে বাঙ্গালীর শরীরে জ্বর আসে—এই সব কথাগুলি যাঁহারা বলিয়া থাকেন তাঁহারা যে বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যাহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জীবন চরিত যাহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালীর মধ্যে এমন অনেক বীর পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল—যাহাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং দীল্লির সম্রাট পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সদাশয় সম্রাট আকবর শাহ লোকান্তরিত হইয়াছেন, তৎপুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। হিমালয়

হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সুদূর কান্দাহার হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত যাহার রাজ্য বিস্তৃত, সমগ্র রাজন্যবর্গ যাহাকে "দিল্লীশ্বরো—জগদ্বীশ্বরো বা" বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার বিরুদ্ধে বাঙ্গলার একজন প্রতাপশালী জমিদারের নাম মহারাজ প্রতাপাদিত্য, প্রতাপ রূপে গুণে ও শক্তিতে বাস্তবিকই আদিত্য সদৃশ্য ছিলেন। তাঁহার প্রতাপের নিকট বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। স্বয়ং সুবাদার পর্য্যন্ত এই বীরপুরুষকে ভয় করিতেন।

যশোহরে প্রতাপাদিত্য রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমানে যশোহর নামে যে জিলা আছে, উহা সেই স্থান নহে। সুন্দরবন অঞ্চলে যশোহর নামে তৎকালে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর ছিল, উহাই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী। এখন সে স্থান জঙ্গলময়। খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি বনময় প্রদেশে প্রতাপাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট বিদ্যমান আছে। নহবৎখানা, ঘড়ীখানা, প্রভৃতি রাজ ভবনের লক্ষণ সমূহ এখনও তথায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই মহারাজ প্রতাপাদিত্য বীরোচিত কার্য্য ভাল বাসিতেন। অশ্বারোহণে, তরবারি প্রয়োগে, বরষা সঞ্চালনে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত,

তিনি কখনও হাসিয়া খেলিয়া সময় নষ্ট করিতেন না, যবনদিগের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে তিনি কখনও পরান্মুখ হন নাই। মৃত্যুর বিভীষিকা মূর্ত্তিতে, শত্রুর ভ্রূকুটি পাতে তিনি কখনও নিজ সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময় বাঙ্গলার জমিদারগণের অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের মত এত হীন ছিল না। তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। নামে মাত্র সম্রাটকে কর দান পূর্ব্বক তাঁহারা স্বাধীন রাজার ন্যায় স্বকীয় জমিদারী শাসন করিতেন। তাঁহাদের সকলেরই সৈন্য ছিল, রণতরি ছিল। সম্রাট বিপদে পড়িয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা সম্রাটকে সাহায্য প্রদান করিতেন।

সময় সময় তাঁহাদের শক্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইত যে তাঁহারা নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এইরূপ এক জমিদার গৃহে প্রতাপাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ, তিনি কায়স্থ কুলের কুলপ্রদীপ। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে বঙ্গদেশে যে সকল

বীরপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহই বুদ্ধিতে প্রতাপের সমকক্ষ ছিলেন না। বলিতে গেলে প্রতাপের পূর্ব্বে বাঙ্গলার কায়স্থ কুলে এমন কোন বীরপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই ; যিনি যবন অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতার জন্য নিজ জীবন দানে প্রস্তুত ছিলেন।

প্রতাপ এ বিষয়ে সকলের আদর্শ স্থল। প্রতাপের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তৎকাল পরবর্ত্তী বীরপুরুষগণ স্বাধীনতার জন্য দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোনও জাতি অন্য কোনও জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়, তখন তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী লোকগণ সকল বিষয়েই শাসিত সম্প্রদায় অপেক্ষা সুখ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। মুসলমানগণের আমলেও তাহাই হইয়াছিল হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানগণ সকল বিষয়েই সুখ সুবিধা ভোগ করিতেন। রাজ্যের উচ্চপদ সমূহে মুসলমানগণ নিযুক্ত হইতেন আর হিন্দুগণ সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ হইয়া, তাঁহাদের অধীনে কাজ করিতেন।

মুসলমানগণ বড় হউক আর ছোট হউক সকল হিন্দুকেই তাহাদিগকে সেলাম করিতে হইত। রাজ্যে কাজি ও মোল্লাগণের অসীম ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন হিন্দুকে শূলে চড়াইতে পারিতেন। বালক প্রতাপের নিকট এসব যেন কেমন কেমন বোধ হইত! কেন হিন্দু, মুসলমানকে এত মান্য করিবে? কেন ব্রাহ্মণগণ, সাধারণ মুসলমানকে সেলাম করিবে? কেন কাজিগণ, হিন্দুগণের নামে মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে শূলে চড়াইবে? বালক এই সব বিষয় সর্ব্বদাই চিন্তা করিত, চিন্তা করিতে করিতে বালকের বদন তেজোময় হইয়া উঠিত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আবার কখনও বা বালক আপনা আপনি বলিয়া উঠিত আমি ইহার প্রতিবিধান করিব। মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিব; গো, ব্রাহ্মণ ও নারীগণকে রক্ষা করিব। বালকের বাক্য সফল হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে কেহই গো, ব্রাহ্মণ ও নারীগণের উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই।

প্রতাপের পিতা পুত্রের এইসব ভাব প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে

তাঁহার পুত্র একজন অদ্বিতীয় বীর হইবে। তাই সুশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া পুত্রের উন্নতির পথ অধিকতর সুগম করিয়া দিলেন। প্রতাপও লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বিদ্যায় সাতিশয় পটু হইয়া উঠিলেন। বড় বড় সেনাপতিগণ বহুকাল যুদ্ধ করিয়া যে সব বিষয় আয়ত্ব করিতে সমর্থ হন; প্রতাপ দুই চারি বারের চেষ্টাতেই তাহা শিখিয়া ফেলিতেন। এইরূপে প্রতাপ অতি অল্প বয়সেই একজন পরাক্রান্ত বীর বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই বীরত্ব কাহিনী সমগ্র বঙ্গ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বীর পুরুষগণ এই তরুণ যোদ্ধার রণকৌশল দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইত। স্বাধীনতা কর্ম্মী অনেক বীরপুরুষ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। এইভাবে তাহার বল ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। তিনি পার্শ্বস্থ জমিদারগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়া নিজ অধিকার ভুক্ত করিতে লাগিলেন। এমন সময় প্রতাপের পিতৃবিয়োগ ঘটে। প্রতাপ পিতৃবিয়োগে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। অশৌচান্তে মহা সমারোহের

সহিত শ্রদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রতাপ রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে সৈন্য সামন্ত বর্দ্ধিত হইল। রাজকোশ অর্থপূর্ণ করা হইল। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করা হইল। যেখানে যেখানে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সেই সব স্থলে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইল। এই ভাবে নিজ রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া প্রতাপ আবার রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। সেই সময় বঙ্গদেশে অনেক জমিদার ছিলেন। প্রতাপ একে একে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য নিজ রাজ্য-ভুক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক জমিদার একেবারে নিঃস্ব হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভে প্রতাপের রাজ্য লিপ্সা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় খুল্লতাত বসন্তরায়ের জমিদারী গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন।

ইহাতে উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে বসন্তরায়ের জীবনলীলা অবসান হয়। বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় কোন প্রকারে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করেন। পিতৃহত্যার পরিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন, এবং স্বীয় অক্ষমতা হেতু

বাঙ্গলার সুবাদার ইস্‌লামখাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব ইস্‌লামখাঁও সহসা প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি এই সব বৃত্তান্ত দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর করিবার জন্য কচুরায়কে সম্রাট সমীপে প্রেরণ করিলেন।

যথা সময়ে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সম্রাট ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। সামান্য বাঙ্গালী জমিদার দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিবে এত স্পর্দ্ধা এত অহঙ্কার এখনই ইহা চূর্ণ করা কর্ত্তব্য। এই মনে করিয়া সম্রাট তৎক্ষণাৎ মানসিংহকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। মানসিংহ সম্রাটের আহ্বানে আগমন করিলে সম্রাট তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার আদেশ দেন। মানসিংহ বঙ্গদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যে সময়ে প্রতাপাদিত্য যশোহরে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় বঙ্গদেশে আরও একজন প্রতাপশালী জমিদার বাঙ্গলায় সুবাদারের অনুগ্রহে দিন দিন উন্নত হইতেছিলেন। এই প্রতাপশালী জমিদারের নাম ভবানন্দ মজুমদার। ভবানন্দ মজুমদার ব্রাহ্মণের পুত্র। বঙ্গেশ্বর আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন তন্মধ্যে

ভট্টনারায়ণ একজন। এই ভট্টনারায়ণের অধঃস্তন পুরুষই ভবানন্দ মজুমদার। ভবানন্দ মজুমদারের পিতামহ কোনও কারণে সম্রাট আকবরশাহের কোপে পতিত হইয়া যবন হস্তে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার বিধবাপত্নী নিরুপায় হইয়া আন্দুলিয়া নিবাসী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তৎকালে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। হরেকৃষ্ণের কোন সন্তান ছিল না। তাই তিনি ঐ কন্যাকে স্বীয় কন্যার মত লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কয়েকমাস পর তাঁহার গর্ভে একটি পুত্র হয়। হরেকৃষ্ণ এই পুত্রটির নাম রামচন্দ্র রাখেন। হরেকৃষ্ণ একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি রামচন্দ্রকে দান করিয়া যান। এই রামচন্দ্রই ভবানন্দ মজুমদারের জনক। ভবানন্দ বাল্যকাল হইতেই মনস্বী, প্রতিভাশালী ও শান্ত স্বভাব ছিলেন। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে সপ্তগ্রামের একজন মুসলমান কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। রাজ-পুরুষ বালকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সপ্তগ্রামে লইয়া যান। সেখানে রাজপুরুষের তত্ত্বাবধানে বালক পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইতে লাগিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর তিনি বালককে

একখানি অনুরোধপত্রসহ ঢাকার নবাব সমীপে প্রেরণ করিলেন। নবাব তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে মজুমদার উপাধি ও রাজস্ব বিভাগের এক উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন।

রাজা মানসিংহের নাম ভারতে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকটেই পরিচিত। রাজপুতনায় অম্বর নামে একটি রাজ্য আছে। রাজা মানসিংহ সেই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; সম্রাট আকবরশাহ রাজপুতনা আক্রমণ করিলে তিনি সম্রাটের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন।

তিনি সম্রাট আকবরশাহ ও তৎপুত্র জাহাঙ্গীর এই উভয় সম্রাটের রাজত্ব কালেই সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পরাক্রমে মানসিংহ অজেয় ছিলেন। যে দিকে সঙ্কটের বিভীষিকা, প্রায় সেই দিকেই তিনি প্রেরিত হইতেন। চিতোরের প্রতাপ ও বাঙ্গলার প্রতাপ এই দুই প্রতাপেরই তিনি সর্ব্বনাশের মূল।

অগণিত সৈন্য সামন্ত লইয়া রাজা মানসিংহ বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। পথ ঘাট সকলই মোগল রাজপুত ও পাঠান সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুই এক দিবসের

ভিতরেই প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবেন, রাজা মানসিংহ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন ; এমন সময় সহসা প্রবলবেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মানসিংহ বিপদে পতিত হইলেন। ঝড় বৃষ্টির বিরাম নাই। সৈন্যগণের দুঃখ ও দুর্গতির এক শেষ হইয়াছে। খাদ্যাভাবে ও ঝড় বৃষ্টির দরুণ অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মানসিংহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি ভবানন্দ মজুমদারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

ভবানন্দ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, যথা সময়ে মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ; তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, সমস্ত শিবির জলে পরিপূর্ণ। সৈন্যগণ তাহাতে অতিকষ্টে বাস করিতেছে। খাদ্যদ্রব্য একেবারেই নাই। সকলের প্রাণই ক্ষুধায় কণ্ঠাগত। অন্নদা ভক্ত ভবানন্দ এই দৃশ্য দর্শনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ দেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন।

দেবী স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ভবানন্দকে দর্শন দেন এবং দেবীর অনুগ্রহে তাঁহাদের সকল দুঃখের অবসান হয়। তৎপর রাজা মানসিংহ ভবানন্দ মজুমদারের অনুরোধে কতিপয় দিবস তাঁহার গৃহে বাস করিয়া

প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য নিজ অনুচরগণসহ তাঁহার সহগামী হইলেন। পথিমধ্যে নবাব ইস্‌লামখাঁও আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

যথা সময়ে প্রতাপাদিত্য এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অত্যন্ত সাহসের সহিত সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ৫২ হাজার ঢালী, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও অগণিত কুঞ্জরাদি লইয়া মানসিংহের অপেক্ষায় রহিলেন। মানসিংহ যথাসময়ে যশোহরের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রথমে তরবারি ও স্বর্ণ শৃঙ্খল প্রেরণ করিয়া প্রতাপকে দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিবার আদেশ দেন। রাজপুত কুলাঙ্গার মানসিংহের এই আচরণে দুঃখিত হইয়া মহাবীর প্রতাপাদিত্য গর্ব্বের সহিত উত্তর করিলেন—

"কহ গিয়ে অরে চর মানসিংহ রায়ে
বেড়ি দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥"

রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের এই দাম্ভিক উত্তরে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষের রণভেরী বাজিয়া উঠিল। একদিকে মোগল-

পাঠান ও রাজপুতসৈন্য, অপরদিকে প্রতাপাদিত্যের বাঙ্গালী সৈন্য। যশোহরের যুদ্ধের দিন বাঙ্গালীবীরের অনন্ত উৎসবের দিন। বাঙ্গালীগণ এই উৎসবে মাতিয়া আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিল। এবং একে একে উৎসবে মাতিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিল। প্রতাপ এই উৎসবে সকলের অগ্রগামী ছিলেন। তিনি নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণের অসির আঘাতে শত শত রাজপুত ও যবন সৈন্য দ্বিখণ্ডিত হইয়া, বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত রণক্ষেত্রে শায়িত হইল। প্রতাপ মত্তহস্তীর মত যুদ্ধ করিতে করিতে যবন সৈন্য দলিত ও মথিত করিতে লাগিলেন। যবন সৈন্যগণ বাঙ্গালীবীরের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালী বীরের বীরত্বে স্তম্ভিত হইলেন। জয় আশায় নিরাশ হইয়া তিনি রণভূমি পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছেন ; এমন সময় যশোহরের রাজপুরোহিত আসিয়া বলিলেন, "আপনি যুদ্ধ করুন ; নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবেন। প্রতাপের আরাধ্যাদেবী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আমি আপনাকে সাহায্য করিব।" হিন্দু হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইল। পুরোহিত নিজকর্ত্তব্য ভুলিয়া যবন পক্ষে যোগদান করিলেন।

চিতোরের রাজপুরোহিত নিজরক্ত দান করিয়া, রাজবংশ রক্ষা করতঃ পুরোহিতের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আর যশোহরের রাজপুরোহিত স্বীয় স্বার্থ সাধনার্থ মোগল পক্ষে যোগদান করিয়া পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে চির কলঙ্ক আনয়ন করিল।

রাজা, পুরোহিতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পুনরুদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রতাপ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া বীরধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না। তিনিও অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এবার বাঙ্গালীসৈন্য মোগলগণের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইতে লাগিল। প্রতাপ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও মানসিংহের হস্তে বন্দী হইলেন। প্রতাপ বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষ্যান্ত হইল না, তাঁহার সেনাপতি প্রভুভক্ত শঙ্কর বন্দোপাধ্যায় প্রভুর রাজ্য রক্ষার জন্য অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষের শরাঘাতে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর বিদ্ধ হইল। তথাপি যুদ্ধে নিরস্ত না হইয়া তিনি সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল।

তিনি সে শর উত্তোলনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পারিলেন না। শরীর অবসন্ন হইল। তিনি অশ্ব হইতে পতিত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আর জাগিলেন না। সৈন্যগণ নেতা বিহীন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। মানসিংহ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতাপাদিত্য রাজা মানসিংহের আদেশে লৌহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায়ই দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। অনাহারে অনিদ্রায় বীরবরের দেহ ভগ্ন হইল। দিল্লীর পথেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তৎপর লিখিতে লজ্জা হয় রাজপুত কুলাঙ্গার তাঁহার এই মৃতদেহ হিন্দু-ধর্ম্মানুযায়ী দগ্ধ না করিয়া যবন সম্রাটের পাদপদ্মে উপহার দিবার জন্য ঘৃতে ভাজিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। বীরের হস্তে বীরধর্ম্ম লাঞ্ছিত হইল। যবন সম্রাট আকবর বন্দী শত্রুকে স্বহস্তে বধ করিতে অস্বীকার করিয়া যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; মানসিংহ বীর-পুরুষ হইয়াও এইরূপ হীন কার্য্য করিয়া তদোধিক নীচতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে সম্রাট

ভবানন্দ ও কচুরায় এই উভয়কেই বিস্তীর্ণ জমিদারী দান করিয়াছিলেন। প্রতাপের পঞ্চভৌতিক দেহ নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ কখনও নষ্ট হইবার নহে। যতদিন বীরত্বের ও তেজস্বীতার আদর থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত প্রতাপের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আজিও বাঙ্গালিগণ, এই বীরপুরুষের নাম স্মরণ করিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। হায় বাঙ্গলার কি আর সেদিন আসিবে না?

সীতারাম রায়

সম্রাট আওরঙ্গজেব লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষীনবীর্য্য বংশধরগণ এক্ষণে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেছেন। আত্মকলহে দিল্লীর রাজবংশ লুপ্ত হইতেছে। আজ যিনি দীল্লির রাজতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন; কাল হয়ত তাঁহার দেহ শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিতেছে। কে ইহার প্রতিকার করিবে? মোগল রাজবংশে তখন এমন কোন বীরপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই, যিনি স্বীয় শক্তিবলে রাজবংশকে সংযত করিয়া ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনে সমর্থ হন। আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফরোক-মিয়ার আজ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে নামেমাত্র সম্রাট হইয়া দিল্লার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারে চারি দিকে বিদ্রোহানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণ নামেমাত্র সম্রাটের অধীন থাকিয়া স্বাধীন ভাবে স্বীয়

রাজ্য শাসন করিতেছে। এই সময় নানকের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সম্প্রদায় গুরুগোবিন্দের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া ধীরে ধীরে আপনাদের মহাশক্তির বিকাশ করিতেছে। মহাবীর শিবাজীর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ আপনাদের অসামান্য শক্তির প্রভাবে সমগ্র ভারতে নিজ প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যত হইয়াছে। আর বাঙ্গলা সেও চুপ করিয়া থাকে নাই। সেও সীতারামের মত বীর পুরুষকে লাভ করিয়া স্বাধীনতা লাভে উদ্যত হইয়াছে। সীতারাম উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। তাঁহার কৌলিক উপাধি বিশ্বাস। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মধুমতি নদীর পূর্ব্বতীরে হরিহর নগর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে সীতারাম জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিলেন। তিনি পুত্রকে লেখাপড়ায় সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় পাঠশালায় প্রেরণ করেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা শিবাজী যেরূপ লেখাপড়া অপেক্ষা যুদ্ধাদি কার্য্য ভাল বাসিতেন; এ বালকও সেইরূপ হইলেন। তিনি বিদ্যালয়ে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকিতেন। নিরীহ পণ্ডিত মহাশয় হওয়া অপেক্ষা সাহসী তেজস্বী ও বীর-পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবার ইচ্ছাই তাঁহার বলবতী ছিল। রাণা রাজসিংহ আপনার বীরত্বে হিন্দু মুসল-

মানকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ-সিংহ আপনার বিক্রমে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিয়া, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন জাতীর শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দাব শেষভাগে সীতারামও সেইরূপ আপনার বীরত্বে ও সাহসে হিন্দুর মুখ উজ্জ্বল করিতে উদ্যত হইলেন।

ফরোক শিযারের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে অনেক পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। তাঁহারা নামে ম'ত্র বাঙ্গালার সুবাদারকে করদান করিয়া স্বাধীন রাজার ন্যায় নিজ নিজ জমিদারী শাসন করিতেন। তাঁহাদের অনেক সৈন্যসামন্ত, রণতরি, অস্ত্রাগার ও অর্থকোশ ছিল। নবাব সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন।

বালক সীতারাম যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইলেন। একান্ত আগ্রহ থাকাতে তিনি সকল বিষয়েই সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন।

সীতারাম অতি অল্প বয়সেই একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তীর সঞ্চালনে সুদক্ষ হইলেন; লাঠিখেলায় ও অসিচালনায় বিশেষ পারদর্শী

হইলেন। তাঁহার অশ্বারোহণ কৌশল ও তরবারী প্রয়োগের ক্ষিপ্রতার কথা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গলার ন্যায় ও দিল্লীর সম্রাট স্তম্ভিত হইতেন। এইরূপে সীতারাম অতি অল্প বয়সেই অদ্বিতীয়বীর বলিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সম্মানলাভ করিলেন। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের হস্তে পড়িয়া বাঙ্গলার ইতিহাস নানা দোষে কলুষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন সাধারণের নিকট ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে বাঙ্গলা কখনও এইরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় নাই। অনেক দোষে বাঙ্গলা দূষিত হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী নিজ স্বাভাবিক তেজস্বীতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যখন ভারতের নানা স্থানে মুসলমান-গণ নিজেদের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন; তখনও বাঙ্গালী নানা স্থানে নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গালায় বিজয়সেনই একদিন দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বাঙ্গলার গঙ্গা বংশীয়েরাই এক-দিবস স্বীয় শক্তিতে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া সমগ্র বীর সমাজে বরণীয় হইয়াছিলেন। একদিবস এই বাঙ্গলার জমিদার রাজাগণেশ ও মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া,

স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিয়া বীর সমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গলায় সীতারামও ক্ষমতা ও তেজস্বীতায় বীরেন্দ্র সমাজে শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীবীরগণ নিয়মিত ভাবে সমর কৌশল শিক্ষা করিতেন। বাঙ্গালী কখনও নিজ আত্মসম্মানে বিসর্জ্জন দেয় নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগলসম্রাটদের আমলেও বাঙ্গালী বীরগণ স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বীরেন্দ্র সমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। হায়, কালের কুটিল আবর্ত্তে বাঙ্গালীর সব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বাঙ্গালী এখন পরপদসেবী কাপুরুষ। বাঙ্গালী এখন শক্তিহীন। বাঙ্গালীর বাহুতে এখন শক্তি নাই। হৃদয়ে এখন বল নাই। বাহুর শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সদগুণ রাশিও চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে পৈতৃক সম্পত্তি অনেকাংশে বর্দ্ধিত করেন। তাঁহার অসামান্য শক্তির কথা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গলায় অনেক বীরপুরুষ তাঁহার দলভুক্ত হন। তাঁহাদিগের সহায়তায় তিনি বিভিন্ন স্থানে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বাধীন ভূপতির সম্মানে সম্মানিত হইলেন। সীতারাম আপন বাহুবলে

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিলেন।

সেই সময় যশোহর দ্বাদশ চাকলায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগে একেক জন জমিদার স্বাধীন ভূপতির ন্যায় নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিতে ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনমুখ অবস্থা সন্দর্শনে তাঁহারা কেহই রাজ সরকারে রীতিমত কর প্রদান করিতেন না। সম্রাট সেই অবাধ্য ভূস্বামীগণকে শাসন করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই সীতারামের ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তাই তিনি এই অবাধ্য ভূস্বামীগণকে দমন করিবার জন্য সীতারামকে অনুরোধ করেন। বাদসাহের অনুরোধ পত্র পাইয়া সীতারাম তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সীতারামের আগমন সংবাদে ভীত হইয়া যশোহরাস্থত জমিদারগণ সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। এইরূপে সীতারাম আপন ক্ষমতা বলে সমগ্র যশোহরের অধিপতি হইলেন।

সম্রাট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিলেন। এই রূপে সামান্য লোকের পুত্র আপন তেজস্বীতার বলে স্বাধীন রাজার পদে বৃত হইলেন।

রাজোপাধিতে ভূষিত .হইয়া সীতারাম আপন রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করিলেন। শত্রুর কবল হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। মধুমতী নদীর পশ্চিম তীরে মহম্মদপুর নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মান করেন। তাহার চারিদিকে পরিখা খনন করা হইল। সীতারাম সেই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তিনি নব নব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া মহম্মদপুরকে সুশোভিত করিলেন।

তাঁহার সেনাপতি মেনাহাতি অতিশয় বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি এই বীর পুরুষের সাহায্যে নিজ আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই সময় বাঙ্গালার সুবেদার ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। মুর্শিদকুলী খাঁ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। পিতা পালনে অসমর্থ হইয়া কোনও বনিকের নিকট পুত্রকে বিক্রয় করেন। ঐ বনিক বালকটিকে ক্রয় করতঃ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শৈশব কাল হইতেই ঐ বালক অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। বণিক বালকের বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত করেন। এই রূপে বালকের ভবিষ্যত উন্নতির পথ সুগম হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সাতিশয় হিন্দুদ্বেষী

ছিলেন ; তাঁহার শাসন সময়ে বাঙ্গালী জমিদারগণের দুর্গতির একশেষ হয়। তাঁহার অত্যাচারে কত সোণার সংসার যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ; তাহার ইয়ত্ত্বা নাই। যদি কোনও জমিদার কোনও কারণে কর প্রদানে অসমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যৎপরো-নাস্তি শাস্তি ভোগ করিতে হইত। এই মুর্শিদকুলী খাঁ এইক্ষণে সীতারামের নিকট রাজস্ব চাহিয়া পাঠাইলেন। সীতারাম নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি তেজস্বীতার সহিত বলিয়া পাঠাইলেন—আমি নবাবের প্রজা নহি। "আমি যশোহরের স্বাধীন নর-পতি, আমার নিকট রাজস্ব প্রার্থনা করা বাতুলের বাতু-লতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

নবাব এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি সীতারামকে দমন করিবার জন্য ভূষ-ণার ফৌজদারকে আদেশ করিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতি-পালিত হইল।

ফৌজদার সসৈন্যে সীতারামকে আক্রমণ করিবার জন্য রওণা হইলেন। সীতারাম এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন ; তিনি তাহাতে ভীত হইলেন না। মোগল অধীনতা স্বীকার করিয়া বীরধর্ম্ম কলঙ্কিত করিলেন না।

উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। যশোহরের হিন্দুসৈন্যগণের অস্ত্রাঘাতে সীতারাম ও তদীয় সেনাপতি মনাহাতীর অপূর্ব্ব বীরত্বে ও কৌশলে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। হিন্দুগণের জয়ধ্বনিতে যশোহর ভূমি কম্পিত হইল। নবাব এই হিন্দু বীরের বীরত্বে স্তম্ভিত হইলেন।

ক্রমে এই সংবাদ দিল্লীর সম্রাটের কর্ণগোচর হইল তিনি আবুতোরাপ নামক এক ব্যক্তিকে ভূষণার ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে সীতারামকে দমন করিবার আদেশ প্রদান করেন। আবুতোরাপ নৈশ আক্রমণে সীতারামকে পরাজিত করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে একদা নৈশ অন্ধকারে মহম্মদপুর দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য রওনা হইলেন। সীতারাম গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া মুসলমান দিগকে আক্রমণ করিলেন। হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া মুসলমানগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। হিন্দু সৈন্যগণের অসির আঘাতে অসংখ্য যবন সৈন্য নিদ্রিত হইল।

আবুতোরাপ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে

বীর শয্যায় শায়িত হইলেন। দলপতির মৃত্যুতে সৈন্য-গণ নিরুৎসাহ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। সীতা-রাম বিজয়ী হইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমণ করিলেন।

পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে নবাব অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। সীতারামকে দমন করিবার জন্য স্বীয় দেওয়ান নাটোরের রাজা রঘুনন্দনের জ্যেষ্ঠ্য ভ্রাতা রাজা রামজীবনকে অনু-রোধ করেন। রামজীবনের সাহসী কর্ম্মচারী দয়ারাম এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। হিন্দু হিন্দুর সর্ব্ব-নাশ সাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সফল হইল। তাঁহারা সম্মুখ সমরে অগ্রসর না হইয়া কৌশলে মেনাহাতীকে ধৃত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে মেনাহাতী ধৃত নিহত হইল। সীতারাম প্রভুভক্ত ভৃত্যের মৃত্যুতে দুখিঃত হইলেন বটে, কিন্তু নিরাশ হইলেন না। তিনি সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বিজয় লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। সৈন্যের হুঙ্কারে, অশ্বের হ্রেষা ধ্বনিতে ও অসির ঝন্ ঝন্ সব্দে রণস্থল মুখরিত হইল। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিতে লাগিল।

দিবাবসান বুঝিতে পারিয়া—মুসলমানগণ "আল্লাহো" রবে দিগন্ত কম্পিত করিয়া হিন্দুগণের উপর প্রবল বেগে পতিত হইল।

হিন্দুগণ এ আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা চারিদিকে পলায়ন করিল। বীর পুরুষ সীতারাম সৈন্যদিগকে স্থির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সৈন্যগণের এইরূপ ভীরুতায় সীতারাম অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন বটে; কিন্তু রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া, তিনি অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ তিনি মুসলমানগণের হস্তে বন্দী হইলেন। সীতা-রামকে বন্দী করিয়া যবনগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। বন্দী বীরকে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে প্রেরণ করা হইল। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার প্রতি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। সীতারাম কঠোর কারা যন্ত্রণা ভোগে অসমর্থ হইয়া হীরকঅঙ্গুরীয় লেহনে মৃত্যুর ক্রোড়ে সুপ্ত শিশুর মত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন মুর্শিদা-বাদ আগমন কালে পথি মধ্যে হীরক অঙ্গুরীয় লেহনে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

এইরূপে বীর বরের বীর জীবনের অবসান হয়। সীতারাম বাস্তবিকই বীরপুরুষ ছিলেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কঠোর শাসনের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যে

স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহাতেই তাঁহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সীতারাম একজন আদর্শ নরপতি ছিলেন। তাঁহার এই স্বল্পকাল রাজত্বের মধ্যেই যশোহর অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়াছিল। তিনি যশোহরের জল কষ্ট নিবারণের জন্য অনেক জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন। প্রজাগণের উপাসনার জন্য তিনি অনেক দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। দীন দরিদ্রগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি স্বহস্তে ধনরত্ন দান করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজাগণের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। প্রজাগণ তাঁহাকে রামরাজার মত দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত।

মহম্মদ পুরের দুর্গ তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি। তিনি এই দুর্গকে সুদৃঢ় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে সুদক্ষ শিল্পি আনিয়া তিনি এই দুর্গের কঙ্কাল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অনেক সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া যশোহরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় কালের কুটিল চক্রে আজ তাহার সবই নষ্ট হইয়াছে, আজ অনেক বৎসর হইল সীতারাম মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালীগণ এখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই, আজিও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা তাঁহাদের আদরের পৌত্র ও পৌত্রিগণের নিকট গল্পচ্ছলে সীতারামের কথা বলিয়া থাকেন।

রাণাপ্রতাপ সিংহ

তোমরা সকলেই রাজপুতনার নাম শুনিয়াছ। রাজপুতনায় মিবার নামে একটি রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের রাজধানী চিতোর। মিবারের রাজাই চিতোরের রাণা নামে প্রসিদ্ধ। যখন মোগল সম্রাট আকবর ও তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন মহাবীর প্রতাপসিংহ মিবারের রাণা। প্রতাপের পিতার নাম উদয়সিংহ। উদয়সিংহ অতি শান্ত প্রকৃতির নরপতি ছিলেন। রাজপুতোচিত সাহস ও কঠোরতা তাঁহার ছিল না। তাই যখন যবন সম্রাট আকবর তাঁহার রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন, তখন তিনি সেনাপতি জয়মল্লের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পর্ব্বত মধ্যে উদয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন।

জয়মল্ল অতিশয় সাহসিকতার সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু অধিকদিন তাঁহাকে নগর রক্ষা

করিতে হইল না। একদা রাত্রিকালে জয়মল্ল মশালের আলোকে ভগ্ন প্রাচীরের সংস্করণ দেখিতেছিলেন, এমন সময় প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, কাপুরুষের মত তাঁহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। সেই গুলির আঘাতেই সেনাপতি জয়মল্লের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। অকস্মাৎ সেনাপতির মৃত্যুতে নগরবাসিগণ নিরুৎসাহ হইয়া পরে। এমন সময় ষোড়শ বর্ষীয় এক বীর বালকের আবির্ভাব হয়। বালকের নাম পুত্ত।

পুত্তের মা কর্ম্মদেবী যখন শুনিলেন, অসংখ্য অসংখ্য মোগল আসিয়া চিতোর আক্রমণ করিয়াছে এবং কাপুরুষ রাণা প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন; তখন তিনি পুত্তকে কহিলেন, "পুত্ত, দ্বারে প্রবল শত্রু উপস্থিত—যাও নিজ বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রুকুল নিপাত করিয়া স্বদেশ রক্ষা কর। মিবার কেবল রাণার নয়, মিবার সমস্ত রাজপুতের। প্রত্যেক রাজপুতেরই মিবারের জন্য যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে তাঁহাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটে দুঃখ নাই। রাজপুত জননী বীর পুত্র চায়, কুলাঙ্গার সন্তানের মাতা হইতে চায় না।" মাতার চরণে প্রণাম করিয়া পুত্ত

সমর প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার বীর মুর্ত্তি দর্শনে শত্রুমিত্র উভয় পক্ষ স্তম্ভিত হইল। কতিপয় দিবস ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পুত্ত অনন্ত শয্যায় শয়ন করিলেন, চিতোর আকবরের হস্তগত হইল।

উদয়সিংহ তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র জগমলকে তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া যান। তাই উদয়সিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর জগমল সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই অবৈধ আচরণে সর্দ্দারগণ বড়ই বিরক্ত হন। তাঁহারা জগমলকে পদচ্যুত করিয়া প্রতাপকে সিংহাসনে বসান।

প্রতাপ রাণা হইয়া, দেখিলেন, মোগলের তুলনায় তাঁহার সৈন্য সামন্ত ও ধন রত্ন কিছুই নাই। বীরপ্রসূ রাজপুতনার রাজন্যবর্গ সকলেই আজ মোগলের করায়ত্ত। তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য সকলই লুপ্ত। তাঁহারা মোগল সম্রাটের দাস। সম্রাট যাহা আদেশ করেন, তাহা পালন করিয়াই কৃতার্থ হন। রাজপুতবালাগণ আজ মোগলগণের বিলাস ভবনের বিলাস সামগ্রীতে পরিণত হইয়াছে। কাহারও সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই। সকলেই বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। কর্ত্তব্য পালন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। হায়, যে রাজপুতনারিগণ

রাজপুতনার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রণরঙ্গিনী ভৈরবীমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিতেন, স্বামি পুত্রের হৃদয়ে উৎসাহ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেন, আজ তাঁহাদের এই হীন দশা।

মাতৃভূমির এইরূপ হীন দশা সন্দর্শনে প্রতাপের হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যতদিন বাপ্পা, সমরের একবিন্দু রক্ত তাঁহার ধমনীতে চালিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। প্রতাপ এইরূপ মহৎ সংকল্পে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতা ও স্বজাতি প্রিয়তা অনুচরগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। তিনি রাজপুতনার প্রধান প্রধান রাজপুতরাজগণকে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন; কিন্তু মোগল ভয়ে ভীত রাজগণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এমন কি এই বিপদের সময়ে তাঁহার নিজ ভ্রাতা শক্তসিংহও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মোগলদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও প্রতাপ নিরাশ হন নাই। তিনি একাকীই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অমিত পরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে ২৫ বৎসরকাল

যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাকে যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। লেখনী দ্বারা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। কখনও অর্দ্ধাহারে কখনও বা অনাহারে বন্য ফলমুল ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জগমলের সহিত পর্ব্বতের গুহায় গুহায় বাস করিতে হইয়াছিল। এত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি মোগলদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এজন্যই প্রতাপের নাম প্রাতঃস্মরণীয়।

চিতোর উদ্ধার প্রতাপের ধ্রুব লক্ষ্য ছিল। এই জন্য তিনি প্রতীজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত চিতোর উদ্ধার না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য থালে ভক্ষণ না করিয়া বৃক্ষপত্রে আহার করিবেন, দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন না করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করিবেন, এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্মশ্রু ধারণ করিবেন। তাঁহার আদেশে অগ্রবর্ত্তী রণবাদ্য সকলের পশ্চাৎ ধ্বনিত হইত। প্রতাপ চিতোর উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া চিরকাল এই প্রতীজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার বংশধরগণ আজ পর্য্যন্তও স্বর্ণ রৌপ্যের

পাত্রের নীচে তৃণ রাখিয়া প্রতীজ্ঞার কতকাংশ পালন করিয়া আসিতেছেন।

শত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষার্থে প্রতাপ অমাত্য-গণ ও সর্দ্দারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করিলেন। যে সকল বর্ত্ম দিয়া মোগলবাহিনী তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে, তিনি তাহা বৃক্ষ ও প্রস্তর দিয়া সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াছিলেন।

যে সকল রাজপুত মোগলদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত্ব লাভের আশায় ভগ্নি ও কন্যা-গণকে মোগল হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, প্রতাপ তাহা-দিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। তাঁহাদের সহিত আহারে বিহারে তিনি নিজকে হেয়ও অপমানিত মনে করিতেন।

একদা মানসিংহ কোলাপুর অধিকার করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন কালে, পথিমধ্যে কমলমীর দুর্গে প্রতাপের দর্শন আশায় তাঁহার আতিপত্য স্বীকার করেন। প্রতা-পের আদেশে উদয় সাগরের তীরে অম্বর রাজের জন্য ভোজের আয়োজন হইল। কুমার অমরসিংহ অতিশয় সমাদরের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আহারে বসাইলেন। মানসিংহ প্রতাপকে দেখিতে না পাইয়া

দুঃখ প্রকাশ করায়, প্রতাপ তাঁহাকে বলিয়া পাঠান যে যিনি নিজ ভগ্নি ও কন্যাকে মোগল হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, প্রতাপ তাঁহার সহিত আহার করিতে পারেন না।

প্রতাপের বাক্যে মানসিংহ নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন, এবং যাবার কালে বলিয়া গেলেন যে, যদি আপনার এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে। পবিত্র গঙ্গাজলে উচ্ছিষ্ট স্থান পবিত্র করা হইলে, এবং যাহারা এই ব্যপারে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারাও সকলে স্নান করিয়া নিজকে পবিত্র করিলেন।

মানসিংহের অপমানকে আকবর নিজের অপমান বলিয়া মনে করিলেন। অবিলম্বেই সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যুবরাজ সেলিমের অধিনায়কতায় পিপিলিকার ন্যায় অগনিত সৈন্য আসিয়া মিবার ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রতাপও চুপ করিয়া রহিলেন। তিনিও স্বদেশ রক্ষার্থে ২২ হাজার সৈন্য নিয়া মোগল বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। হলদিঘাট নামক গিরিশঙ্কটে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। হলদিঘাটের যুদ্ধ রাজপুতদিগের পক্ষে অতি আনন্দের দিন। সে আনন্দে মাতিয়া কত রাজপুত যে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছেন তাহার

ইয়ত্বা নাই। প্রতাপ এই আনন্দে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রথমে অম্বররাজ মানসিংহের প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু মান অসংখ্য মোগল সৈন্য মধ্যে ছিলেন, প্রতাপ সেই সৈন্য ভেদ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কুলাঙ্গার বলিয়া গালি দিলেন। তারপর যে দিকে খুবরাজ সেলিম সৈন্য চালনা করিতেছিলেন সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার অস্ত্রাঘাতে মাহুত ও দেহরক্ষকগণ অচিরেই ভূমিসাৎ হইল।

প্রতাপ নির্ভিক চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনবার তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। রাজপুত বীরগণ নিজ জীবনের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার সাধন করিয়াছে। কিন্তু প্রতাপ নিরস্ত হইলেন না। ক্ষত বিক্ষত দেহে আবার শত্রু মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবার তাঁহার উদ্ধার সাধন অসম্ভব হইয়া উঠিল। জননী জন্মভূমির রক্ষার জন্য চৌহান, রাঠোর ও মোলকুলের বীরগণ একে একে সকলেই অসি হস্তে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছে। দৈল বারার বীরমল্ল ইহা দেখিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপন অনুচরগণ তাঁহার উদ্ধারার্থে অগ্রসর হন। এবার মোগল সৈন্য ভেদ হইল। প্রতাপ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু বীরমল্ল

ফিরিলেন না। প্রভুর জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি বীর ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও রাজপুত জয়লাভে সমর্থ হইলেন না। চোদ্দ হাজার রাজপুত রক্তে হল্‌দিঘাট ধৌত হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

প্রতাপ যে অশ্বে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন, তাহার নাম চৈতক। চৈতক প্রভুর উপযুক্ত বাহন ছিল। সে নাচিতে নাচিতে রনোন্মত্ত প্রভুকে লইয়া মত্ত হস্তীর উপর লাফাইয়া উঠিত। তাহার গুণেই তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার পলায়ন কালে দুইজন মোগল সৈন্য তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। প্রতাপের কনিষ্ঠ ভাই শক্তও সেলিমের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। ভ্রাতার এই বিপদে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতাপের অসীম তেজস্বীতা ও সাহসিকতা দর্শণে তাঁহার হৃদয়ে বৈরী ভাব দূর হইয়া পবিত্র ভ্রাতৃভাবের উদয় হইল। তিনি অশ্রু জলে বক্ষস্থল শিক্ত করিতে করিতে ভ্রাতার রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন, এবং অচিরেই সৈন্য দ্বয়কে নিধন করিয়া প্রতাপের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইয়া প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন মিবারের জ্ঞাতি শত্রু শক্তসিংহ আসিতেছেন। ক্ষোভে ও রোশে প্রতাপ বর্শা উত্তোলন করিলেন, কিন্তু একি শক্ত যে কাঁদিতেছে। হস্তস্থিত বর্শা হস্তেই রহিল। শক্তসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভ্রাতার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থণা করিলেন। প্রতাপ সব ভুলিলেন। বহুদিনের শত্রুতা এক মুহূর্ত্তে দূরীভূত হইল। প্রতাপ শক্তকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের অশ্রুজলে উভয়ের বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। কি মধুর দৃশ্য, কি সুন্দর মিলন। ভ্রতায় ভ্রতায় এমন মিলন এক ভারতেই সম্ভব।

এইরূপ আনন্দের সমর প্রতাপের প্রিয়তম অশ্বের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। প্রতাপ অশ্বের মৃত্যুতে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, এবং তাহার স্মরনার্থ একটী বেদী নির্ম্মান করেন। তাহা আজও "চৈতকা চতুর নামে প্রসিদ্ধ আছে।

হল্‌দিঘাটের মহা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুবরাজ সেলিম রণভূমি পরিত্যাগ করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর প্রতাপের হস্তচ্যুত হইল। সমগ্র মীবারভূমি মোগল সৈন্যে আচ্ছন্ন হইল। এই সময় প্রতাপের কষ্টের

একশেষ হয়। অনুসরনকারী মোগলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রতাপকে পরিবার বর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে এক গহ্বর লইতে অন্য গহ্বরে ঘুরিতে হইত। কিন্তু ইহাতেও প্রতাপ বিচলিত হইলেন না। বাপ্পা সমরের রক্ত কলুষিত করিলেন না। রাজ্য উদ্ধারের জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার শত চেষ্টা বিফল হইল। দৈব শক্তি যখন প্রতিকুল হয়, মানুষ তখন তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। প্রতাপ মানুষ, মানুষের যতদূর শক্তি যতদূর সাধ্য প্রতাপ ততদূর সহ্য করিয়াছে, আর পারিলেন না।

একদা কোন রূপ খাদ্যের সংস্থান করিতে না পারিয়া তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূ একপ্রকার ঘাসের বীজ দিয়া কয়েক খানা রুটী তৈয়ার করেন। সেই খাদ্যের কতক অংশ তখন ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ ছেলে মেয়েদের জন্য রাখিয়া দেন। প্রতাপের একটী কন্যা তাহা ভক্ষণ করি-তেছিল, এমন সময় একটী বন্য বিড়াল আসিয়া সেগুলি অপহরণ করে। ক্ষুধার্ত্ত মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল। অদূরে প্রতাপ বৃক্ষতলে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আপন অদৃষ্টের

বিষয় ভাবিতেছিলেন। কন্যার রোদনে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটী বিড়াল রুটী খানা মুখে করিয়া পলায়ন করিতেছে।

প্রতাপ পরম স্নেহাস্পদ অনুচর বর্গের নিধন, হলদিঘাটের রক্তনদী ও মেবারের দুরবস্থা অম্লান বদনে হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুধাতুর মেয়ের সকরুণ দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার ক ঠারতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দুর্ব্বলতা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি পরিবার বর্গের দুঃখ দূর করিবার মানসে, আকবরের অধীনতা স্বীকার করিবেন বলিয়া অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

দিল্লীতে মহাউৎসবের ধুম পরিয়া গেল। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে মোগলের অর্দ্ধ চন্দ্র লাঞ্ছিত বিজয় পতকা উড্ডীন হইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি কদলি বৃক্ষ রোপিত হইল। নানা রূপ আলোক মালায় সুসজ্জিত হইয়া দিল্লী নগরী অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

প্রতাপ অকবরের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন বিকানীর পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ তাহা দেখিতে পান। পৃথ্বীরাজের হৃদয় স্বজাতী প্রিয়তায় পরিপূর্ণ ছিল।

প্রতাপ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিবেন ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি প্রতাপের নিকট একখানা পত্র লিখিলেন। পত্র খানার সার মর্ম্ম এই।

মহারাজ, ভারতের আশা ভরসা স্থল একমাত্র আপনি। সমগ্র রাজপুতনা ভূমি একমাত্র আপনার জন্যই এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। আমাদের সর্দ্দারগণের তেজস্বীতা নাই। নারীগণের সতীত্ব গৌরব নাই। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই আকবর-কেও একদিন বিদায় নিতে হইবে। তখন সকলেই খাটি বীজের জন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত হইবে। যাহাতে বীজ খাটি থাকে, এবং যাহাতে আবার রাজপুত জাতি নিজ কলঙ্ক কালিমা ধৌত করিয়া সমুজ্জ্বল হইতে পারে তাহাই করিবেন।

বশ্যতা স্বীকার পত্র পাইয়া প্রতাপ মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছিলেন। এইক্ষণে পৃথ্বীরাজের উৎসাহপূর্ণ পত্র পাইয়া, তাঁহার হৃদয়ের বল ও উদ্যম শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থে সিন্ধু নদের তীরে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

প্রতাপ প্রাণ ভরিয়া চির কালের জন্য জন্মভূমিও

অতি সাধের চিতোর দুর্গ দেখিয়া লইলেন। তারপর পরিবার বর্গ ও বিশ্বস্ত অনুচর বর্গের সহিত আরাবল্লী পর্ব্বত অবতরণ করিয়া মরু প্রান্তে উপস্থিত হন। এই খানে তাঁহার মন্ত্রী পূর্ব্ব পুরুষ গণের উপার্জ্জিত অর্থরাশী আনিয়া প্রতাপকে দান করেন। ইহার পরিমাণ এত ছিল যে ইহা দ্বারা বিংশতি সহস্র লোকের দ্বাদশ বৎসর ভরণ পোষন চলিত।

এইরূপ অযাচিত প্রাপ্তিতে প্রতাপের হৃদয়ে আবার উৎসাহ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি মিবার ত্যাগ সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। আবার নূতন উদ্যমে সৈন্যদল গঠন করা হইল। প্রতাপ ইহাদিকে লইয়া আবার স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মোগল সেনাপতি শাহবাজ খাঁ সসৈন্যে দেওরীরে অবস্থান করিতেছিলেন, প্রতাপ প্রবল বেগে তাহার উপর পতিত হইয়া সৈন্যগণকে ধ্বস্ত 'বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। শাহ-বাজ খাঁ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে চিতোর আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমগ্র মিবার অধিকার করিয়া ফেলিলেন।

প্রতাপের এই আকস্মিক বিজয় সংবাদ অচিরেই দিল্লীতে পেঁৗছিল। প্রবল পরাক্রান্ত মোগলগণ ১০

বৎসর কাল বহুতর অর্থ ব্যয় ও সৈন্য নষ্ট করিয়া যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। প্রতাপ এক দেওয়ীয়ের দ্ধ জয়লাভ করিয়াই তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন। মেবারে আর মোগল সৈন্য দৃষ্ট হইল না। প্রতাপের বিজয় লক্ষী অচলা হইলেন।

এইরূপে বিজয়লাভ করিয়াও প্রতাপ হৃদয়ে শান্তি পাইলেন না। তাঁহার চির সাধের চিতোর আজও মোগলের করায়ত্ব। এই ত সেই চিতোর যেখানে বাপ্পা অবস্থান করিতেন, যেখানে রাণী পদ্মিণী শত শত রাজপুত রমণী সহ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়া পরিয়াছিলেন, যেখানে পুত্ত ও জয়মল্ল স্বদেশ রক্ষার জন্য অম্লান বদনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ সেই চিতোর মরুভূমি ও শ্মশানে পরিণত। এই সকল চিন্তা সর্ব্বদা প্রতাপের হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশনের মত দংশন করিত।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে, অনাহারে, অনিদ্রায় প্রতাপের শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে দারুণ রোগ আসিয়া তাঁহাতে আক্রমণ করিল।

প্রতাপের পুত্র অমর পিতার মত কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন না। তাই প্রতাপ তাঁহার প্রতি আস্থা শূন্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এত সাধের মেবার মোগলের করায়ত্ব হইবে, এই চিন্তা আসন্ন মৃত্যু সময়েও প্রতাপকে কষ্ট

দিতে লাগিল। একজন সর্দ্দার তাঁহার বিকৃত মুখ দর্শনে, কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রতাপ উত্তর করিলেন "যাহাতে স্বদেশ মোগলের হস্তগত না হয়, এবং যাহাতে এই কুটিরগুলি সমগ্র মিবার স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রসাদে পরিণত না হয়, এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইবার জন্য আমার প্রাণ বায়ু অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছে।" সর্দ্দারগণ সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "তাহারা জীবিত থাকিতে মিবার মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করিবে না এবং যে পর্য্যন্ত সমগ্র মিবার স্বাধীন না হয় কুটীরগুলি প্রসাদে পরিণত হইবে না। প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, মুহূর্ত্তের তরে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল।

১৫৯৭ খৃঃ অব্দে স্বদেশ বৎসল বীরপুরুষ প্রতাপ মানব লীলা সম্বরণ করেন। প্রতাপের পঞ্চভৌতিক দেহ লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার অদম্য অধ্যবসায় স্বদেশ প্রীতি ও স্বজাতি বৎসল কখনও লুপ্ত হইবার নহে। শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত রাজপুতগণ এই বীর পুরুষের নাম ভুলিতে পারেন নাই। যতদিন জগতে বীরত্বের আদর থাকিবে, তত দিন এই অলোক সামান্য মহাবীরের নাম ইতিহাসে জাজ্বল্য অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

রাণা রাজসিংহ।

সদাশয় আকবর শাহের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন একমাত্র *মেবার ব্যতিরেকে ভারতের প্রায় সকল স্থানই জাহাঙ্গীরের অধিকৃত। ভারতের প্রায় সকল রাজন্যবর্গ যাঁহাকে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলিয়া পূজা করেন, ক্ষুদ্র মিবার রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন না; এত দর্প এত অহঙ্কার এত গর্ব্ব কেন? সে দর্প সে অহঙ্কার সে গর্ব্ব চূর্ণ করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ সংকল্প করিয়া সম্রাট মিবারের প্রতিকুলে রণ সজ্জায় সজ্জিত হইলেন। অবিলম্বেই রণ ভেরী বাজিয়া উঠিল। মহাবীর প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ তখন মিবারের রাণা। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। প্রতাপের মত তাঁহারও শৌর্য্য, বীর্য্য এবং অধ্যবসায়ের অভাব ছিল না। মোগলের সাদর আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারি-

লেন না। দেবীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। স্বদেশের গৌরব রক্ষার জন্য অমর সিংহ রণ মদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দর্শনে শত্রু মিত্র উভয় পক্ষই স্তম্ভিত হইল। অসংখ্য অসংখ্য যোদ্ধা চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। কোন পক্ষেই জয় পরাজয় লক্ষিত হইল না।

দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, এমন সময় সমস্ত রাজপুতগণ সিংহনাদ করিতে করিতে মোগল সেনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসংখ্য অসংখ্য যবন সৈন্য রাজপুতের অস্ত্রাঘাতে বাতাহত কদলি বৃক্ষের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। মোগলগণ এবার রাজপুতের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অমর সিংহ বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

জাহাঙ্গীর পরাজিত হইয়াও নিরুদ্যম হইলেন না। পুনরুদ্যমে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। আবার রণপুর নামক প্রশস্ত পর্ব্বত পথে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এবারও বিশাল মোগল সৈন্য ভেদ করিয়া রাজপুতগণ যবন সৈন্য দলিত, মথিত ও বিধস্ত করিতে লাগিলেন। অসংখ্য অগণিত যবন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে

অনন্ত শয্যায় শয়ন করিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া ইতঃস্তত পলায়ন করিতে লাগিল।

উপর্য্যুপরি ২টি যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে দিল্লীশ্বরের হৃদয় শঙ্কিত ভীত ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। কিরূপে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়া অমরসিংহ এত বড় বিশাল বাহিনীকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়, কিছুতেই তিনি তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রোধে ও জিঘাংশায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আবার নূতন উদ্যমে সমরায়োজন আরম্ভ করিলেন; এবং রাজপুতসৈন্য ক্ষয় করিবার মানসে একটি কৌশল ও অবলম্বন করিলেন।

রাজপুত কুলাঙ্গার সাগরজীকে তিনি স্বহস্তে রাজ্যা-ভিষেক করিয়া যবন অত্যাচারে শশ্মানে পরিণত চিতোরে রাণা করিয়া পাঠান। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। কেহই তাঁহাকে রাণা বলিয়া সম্বোধন করি-লেন না। চিতোরে বাস করা সাগরজীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি যেন সর্ব্বদাই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণকে দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা যেন তাঁহাকে কুলা-ঙ্গার, ভ্রাতৃদ্রোহী বলে মারিতে আসিত; তিনি ভয়ে দূরে সরিয়া যাইতেন। এইরূপভাবে ৭ বৎসর কাল চিতোরে বাস করিয়া সাগরজী অমরসিংহের হস্তে চিতোর

অর্পণ করতঃ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলেন ; এবং সম্রাট সম্মুখে নিজ ছুরিকা বক্ষে বসাইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

প্রতাপের চির অভিপ্সিত চিতোর এইরূপে অমরসিংহের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষ্যান্ত হইল না। বীরকেশরী প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর অমরসিংহ সপ্তদশ বার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং প্রত্যেক বারই বিজয় লাভ করিরাছিলেন।

পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া সম্রাটের হৃদয় মহা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পুনরায় মহা সমরের আয়োজন করিয়া তিনি যুবরাজ খুরমকে মিবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। খুরম অল্পবয়সেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিলেন ; বীরত্বে, সাহসে ও বিক্রমে তিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনিই পরে শাহজাহান নামে পরিচিত হন।

বার বার যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষুদ্র মিবার শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকোষ অর্থ শূন্য, অস্ত্রাগার অস্ত্র শূন্য ও নগর বীর শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অমর বুঝিতে পারিলেন এবার রক্ষা নাই। মোগল বাহিনীর গতিরোধ করা এবার তাঁহাদের অসাধ্য। শত শত ঝঞ্জা-

বাতের মধ্যেও মিবারের যে স্থানটুকু অক্ষত ছিল, এবার তাহাও নষ্ট হইবে। অমর একটি দার্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।" যে মিবার ভূমির রমণীগণ পর্য্যন্ত শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বীরাঙ্গনার পরিচয় দিয়াছেন, অধঃ-পতন অনিবার্য্য বলিয়াই কি যবন সম্রাট সেই মিবার ভূমিকে মেষের মত শৃঙ্খলা বদ্ধ করিবেন? আমরা কি তবে মেষ? তাহা কখনই হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাহুতে শক্তি থাকিবে, হৃদয়ে স্পন্দন থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যূদ্ধ করিব। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, অমর যথাসাধ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া, মোগল বিরুদ্ধে রওনা হইলেন। অবিলম্বেই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এবার মোগল প্রতাপের নিকট রাজপুত প্রতাপ তিষ্ঠিতে পারিল না। মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য অচিরেই মোগল সেনা সাগরে ডুবিয়া গেল. এইরূপে বাপ্পা সমরের সাধের মিবার মোগলের করায়ত্ত হইল। মিবার মোগল সম্রাটের করদ রাজ্যে পরিণত হইল।

অমর ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি পুত্র কর্ম্মকে রাজ তক্তে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। রাণা কর্ম্ম প্রায় ৮ বৎসর কাল পরম শান্তির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৬২৮ খৃঃ অব্দে স্বীয়

পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। রাণা জগৎসিংহের রাজত্বকালে সমস্ত মিবাররাজ্যে শান্তি ছিল। কোনও শত্রুর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ না থাকায় তিনি মিবারের আভ্যন্তরিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সময়ে মিবার স্থাপত্য বিদ্যায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ষড়বিংশতি বৎসর রাজত্ব করিয়া জগৎসিংহ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসিংহ মিবারে রাণা হইলেন।

তখন বৃদ্ধ শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট। তাঁহার জীবদ্দশাতেই তদীয় পুত্রগণ সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য উদ্যত হইল। বৃদ্ধ সম্রাট তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। অবিলম্বেই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। চারি ভাই দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব সকলেই রাণা রাজসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রাণা রাজসিংহ রাজপুতনার সমস্ত নৃপতিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দারার পক্ষ সমর্থন করিলেন। ফতিহাবাদ ক্ষেত্রে সকলেরই সাক্ষাৎ হইল। কুটনীতি বিশারদ আওরঙ্গজেবের চতুরতায় ও কৌশলে দারা,

সুজা ও মুরাদ ৩ জনই পরাজিত হইলেন। বিজয়লক্ষী সম্রাট আওরঙ্গজেবের অঙ্কশায়িনী হইলেন।

রাজ্যলাভ করিয়াও আওরঙ্গজেব শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। যাঁহারা যাহারা তাঁহার সুখভোগের পথে কণ্টক স্বরূপ ছিলেন, তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য তিনি অসি হস্তে ধাবিত হইলেন। পিতৃ ভ্রাতৃ ও অন্যান্য আত্মীয়গণের রক্তে অসি রঞ্জিত করিলেন। রাজ্য লিপ্সার বশীভূত হইয়া, তিনি যে সকল জুগুপ্সিত ও পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাজাহান উভয়েই আকবরের উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। উচ্চ ও দায়িত্বজনক রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। যাহাতে হিন্দুগণের মঙ্গল হয়, সেইদিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। জাহাঙ্গীর ও শাজাহান উভয়েই রাজপুত রমণীর গর্ভজাত; তাই তাঁহারা হিন্দুগণের মঙ্গল সাধনে রত থাকিতেন। হিন্দুগণও তাহার প্রতিদানে তাঁহাদের জন্য নিজ হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আওরঙ্গজেব সেই মহান নীতির উপকারীতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া

তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তাঁহারই ফলে আবার ভারতে হিন্দুমুসলমানে জাতি বৈরতা বহ্নি প্রজ্জ্ব-লিত হইয়া উঠিল। সুবিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্য অচিরেই তাহাতে দগ্ধ হইয়া ছারখার হইল।

তাতার রমণীর গর্ভে দুরাচার আওরঙ্গজেবের জন্ম। তাতার শোণিতে তিনি পরিপুষ্ট—সুতরাং রাজপুতগণের সহিত তাঁহার সহানুভূতি অসম্ভব। যখন আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া সহোদরগণের হৃদয় শোণিত পান করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন, তখন রাজপুতনার প্রায় অধিকাংশ নৃপতিই তাঁহার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়াছিলেন। তখনই হিন্দুগণের উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সময় পাইয়া তিনি তাহার প্রতিশোধ নিতে সংকল্প করিলেন। তিনি রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে তাঁহার রাজ্যে যে সকল হিন্দু প্রজা বাস করে; অচিরেই তাহাদিগকে ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে জোর করিয়া ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইবে, যবন কুলাঙ্গার আওরঙ্গজেবের কঠোর আদেশ প্রচার হওয়া মাত্র হিন্দুগণ স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। অনেকে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাপথে পলায়ন করিলেন; অনেকে নিজ জীবন সর্ব্বস্ব পুত্র কন্যার প্রাণ সংহার করিয়া বিষ পানে নিজ জীবন ত্যাগ করিলেন। রাজ্যের চারিদিকেই হাহাকার, চারিদিকেই শোক রোল, চারিদিকেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। কেবল ইহাতেই আওরঙ্গজেবের পাপ বাসনা পূর্ণ হইল না তিনি হিন্দুগণের উপর মুণ্ডকর স্থাপন করিলেন। দেবালয়গুলি ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্মভীরু হিন্দুগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে ভারতভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সাহস, অধ্যবশায়, বিক্রম বীর্য্যবত্তা লোকরঞ্জকতা প্রভৃতি যে সকল গুণ রাজার প্রকৃত অলঙ্কার রাণা রাজসিংহ সেই সমস্ত গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার হৃদয় বীর ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শৈশবকাল হইতেই আওরঙ্গজেবকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার নাম শুনিলেই তাঁহার মুখে বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়া উঠিত। দুরন্ত যবন হস্ত হইতে মিবারের চির স্বাধীনতা উদ্ধারে স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিরূপে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, অনুক্ষণ তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; এবং অচিরেই একটি সুযোগ আসিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল।

রূপনগরেরের রাজকন্যা প্রভাবতি অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবিলম্বেই দ্বিসহস্র অশ্বারোহী রূপনগরাভিমুখে ধাবিত হইল। রূপনগর রাজ এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল-সম্রাটের বিপক্ষে অসি ধারণ করিলে তিনি যে পতঙ্গের মত ভাস্মভূত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রভাবতিকে রক্ষার উপায় কি? ক্রমে প্রভাবতিও এই সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতৃ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া বিপদ উদ্ধারের উপায় নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সামন্ত রাজ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। প্রভাবতি তখন নিরুপায় হইয়া রাণা রাজসিংহের নিকট পত্র দিলেন।

যথা সময়ে পত্র রাজসিংহের হস্তগত হইল। পত্র-খানি অতি সুন্দর, মনোজ্ঞ ও উত্তেজক ভাবে পরিপূর্ণ। রাজসিংহ পত্রখানি পাঠ করিয়া যুগপত ক্রোধেও জিঘাংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যে মিবার শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ, যে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শত শত রাজপুত আপন আপন বীরত্ব

প্রকাশ করিয়া অসি হস্তে যুদ্ধ করিয়া ।চঃনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, যে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীর কেশরী প্রতাপসিংহ দুঃখ দারিদ্র্য সহ্য করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন; যাঁহার অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শনে প্রতাপ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটগণ মোগলের জায়গীরদার।

রাণা রাজসিংহ এই কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, অথবা সুবিধা পাইয়া এই সূত্র ধরিয়া মোগল বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবিলম্বেই বীরবালিকা প্রভাবতির উদ্ধারের জন্য রাজপুত সৈন্যসামন্তগণ সিংহনাদ করিতে করিতে রূপ নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদমূলে রূপনগর রাজ্য অবস্থিত। রাজপুত সৈন্যগণ আরাবল্লী পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক যবন সৈন্য আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। রাণা রাজসিংহ সিংহবিক্রমে মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শত শত মোগল সৈন্য রাজপুতগণের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্তুপিকৃত হইয়া পড়িল। অবশিষ্টগণ প্রাণ ভয়ে ভীত

হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। রাজসিংহ বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে অনুপমা সুন্দরী প্রভাবতিকে নিয়া নিজ রাজ্যে আগমন করিলেন। রাজ্ঞীর আগমনে মিবারবাসীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সমস্ত নগরী আনন্দময়ী মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। রাজপথ আলোক মালায় ও কুসুমদামে সুসজ্জিত হইল। ঘরে ঘরে নৃত্য গীত আমোদ প্রমোদ ও মহোৎসব, আরম্ভ হইল।

জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ ও যোধপুরাধিপতি যশোবন্ত সিংহ এই দুইজন সম্রাট আওরঙ্গজীবের অধীনে বড় সেনাপতি ছিলেন ; মোগল সাম্রাজ্যের সমস্ত রাজপুত সৈন্যই তাঁহাদের অধীনে ছিল। তদ্ভিন্ন অনেক সৈন্য ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অনুগত হইল। যদিও এই দুই বীর মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা স্বধর্ম্মচ্যুত হন নাই। যখনই আওরঙ্গজেব কোন-রূপ ন্যায় বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইতেন তখনই তাঁহারা ক্রুদ্ধকেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহার কার্য্যে বাধা প্রদান করিতেন। তাই আওরঙ্গজেব তাঁহার অভিপ্সিত পৈশাচিক কার্য্য সকল করিতে

পারিতেন না। আওরঙ্গজেব ইহাদের কার্য্যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রবল পরাক্রমে ভয় কিছুই বলিতে সাহস পাইতেন না। অবশেষে স্থির করিলেন, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া নিজ পথ পরিস্কার করিবেন। কাজেও তাহাই হইল, বিশ্বাসী প্রভুভক্ত জয়সিংহ দাক্ষিণাথে রাষ্ট্রবীর শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে আর সেখান হইতে ফিরিতে হইল না। আওরঙ্গজীবের প্রেরিত গুপ্তচর কর্তৃক সেখানেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। এই সময় যশোবন্ত কাবুলে ছিলেন; অচিরেই সংবাদ আসিল যশোবন্ত আর ইহলোকে নাই।

এই দুই বীরের মৃত্যুতে আওরঙ্গজীব অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, এবং মনে করিলেন এখন নিরুদ্বেগে ও নিষ্কণ্টকে নিজ অভিপ্সিত কার্য্য করিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার সে সংকল্প সিদ্ধ হইল না। স্বজাতি বৎসল স্বদেশ প্রেমিক বীরপুঙ্গব রাণা রাজসিংহের মহা পরাক্রমের সম্মুখে তাহা সমুদ্র সলিলে ভাসমান তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়া গেল।

ভারতে হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ এই দুই বীরের হৃদয়-রক্ত পান করিয়াও আওরঙ্গজীবের কলুষিত আত্মা তৃপ্ত হইল না। যশোবন্তসিংহের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রগণকে

তিনি কারারুদ্ধ করিতে সংকল্প করিলেন। অচিরেই মারাবারের বিধবা রাজমহিষী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রগণের জীবনাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তিনি রাণা রাজসিংহের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন।

যথা সময়ে দূত মিবারে উপস্থিত হইল। রাণা আনুপূর্ব্বিক পত্র খানা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ মারাবার রাজ্ঞীর প্রার্থনায় সম্মতি দান করিলেন। মারাবার রাজকুমারগণকে অবিলম্বেই মারাবার হইতে মিবারে আনা হইল। তাঁহারা রাণার আশ্রয়ে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

যশোবন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিতসিংহ যখন মিবারে আগমন করেন, তখন দ্বিশত মহাবল রাজপুত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহারা যখন আরাবল্লী পর্ব্বতমালার দুর্ভেদ্য কুটবর্ত্ম মধ্যে উপস্থিত হইল, একদল মোগল সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রায় পঞ্চ-সহস্র যবন সৈন্য চারিদিক বেষ্টন করিয়া অজিতকে হরণ করিবার উদ্যোগ করিল। রাঠোর বীরেরা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক যবন সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে অজিত ও দেহরক্ষকগণসহ নিরাপদে মিবারে উপস্থিত হইলেন। দুর্গাদাস নামক একজন রাঠোর বীর অজিতের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন।

মারাবার রাজ মহিষীও পুত্রের সহিত মেবারে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ২।৩ দিন অবস্থান করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিরূপে হিন্দু-গর্ব্ব খর্ব্ব কারী দুরাত্মা আরঙ্গজেবকে প্রতিফল প্রদান করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহাতে রাজপুতনার প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গ একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজেবের পাপের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারই চেষ্টার ফলে মিবার মারাবার ও অম্বর একত্র হইয়া রাণা রাজ-সিংহের অধিনায়কতায় আওরঙ্গজেবের প্রতিকূলে দণ্ডায়-মান হইলেন। কিন্তু ভারতমাতার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে একতা অধিক দিন স্থায়ী রহিল না।

নানারূপ অতিরিক্ত ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য প্রায় দেখিয়া মোগল সম্রাট যবন হিন্দুপ্রজাগণের উপর মুণ্ড-কর স্থাপন করিলেন, করভারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারা যে সময় আর্ত্তনাদে ভারতভূমি প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল, বীরকেশরী রাণা রাজসিংহের হৃদয় তখন বড়ই

ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থে বদ্ধ পরিকর হইলেন। মুণ্ডকর প্রতিবাদ করিয়া তিনি আওরঙ্গজীবের অতি বিনয় ও দৃঢ়তার সহিত একখানি পত্র লিখিলেন।

অপমানের উপর অপমান। প্রতিশোধের উপর প্রতিশোধ, কি আস্পর্দ্ধা, সামান্য সামন্তরাজ হইয়া দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের নিকট প্রতিবাদ পত্র। আও-রঙ্গজীব অনেক সহ্য করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। প্রভাবতিকে হরণ অজিতকে আশ্রয় দান রাণা রাজ-সিংহের এই দুই অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজকার্য্যে প্রতিবাদ করিবার অপরাধ তিনি ক্ষমা করিতে পারিলেন না। ওজস্বিনী ভাষার লিখিত পত্র পাঠ করিয়া আওরঙ্গজীবের হৃদয়বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে জিঘাংসার উদয় হওয়াতে সম্রাট একে-বারে অধীর হইয়া উঠিলেন। রাণা রাজসিংহকে শাস্তি দিবার জন্য অবিলম্বে বিপুল সমরায়োজন করিবার আদেশ দিলেন।

অবিলম্বেই আদেশ প্রতিপালিত হইল। রাণা রাজসিংহ অপরিমেয় শক্তিশালী মোগল সম্রাটের সামান্য একজন জায়গীরদার মাত্র। কিন্তু তাহাকে আক্রমণ

করিবার জন্য যে আয়োজন হইল, একজন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও এত আয়োজনের দরকার হয় না। কুমার আকবর বঙ্গদেশ হইতে—কুমার আজীম কাবুল হইতে ও মোজাম দাক্ষিণাত্য হইতে সম্রাটের আদেশে সসৈন্যে দিল্লীতে আগমন করিলেন। এইরূপে সমগ্র শক্তি একত্র হইলে সম্রাট এই বিশাল বাহিনী লইয়া মেবার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে উদ্বেলিত সাগর তরঙ্গের ন্যায় মোগল সৈন্য সিংহনাদ করিতে করিতে মেবারে প্রবেশ করিল। দূর হইতে রাণা রাজসিংহ সেই ভীমরব শ্রবণ করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। যবনের রণপিপাসা দূর করিবার জন্য অবিলম্বে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন।

মারাবার রাজকুমারদের প্রতি নরাধম আওরঙ্গজীবের দুর্ব্যবহারে রাজপুতনার সমস্ত রাজগণই তাঁহার উপর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই যখন আওরঙ্গজেব মিবার আক্রমণ করেন, তখন অনেকেই নিজ সৈন্য সামন্ত নিয়া রাণা রাজসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর আবার সমস্ত রাজপুত শক্তি রাণা রাজসিংহের অধিনায়কতায় মোগল বিরুদ্ধে

দণ্ডায়মান হইল। রাণা সঙ্গের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এখন রাজসিংহের উদ্দেশ্য হইল সম্রাটের অত্যাচার হইতে হিন্দুধর্ম্ম; আত্মমর্য্যদা ও নিজেদের রাজ্য রক্ষা করা। বিশাল যবন বাহিনীর সহিত তুলনায় নিজেদের সৈন্যের স্বল্পতা দর্শনে রাণা রাজসিংহ প্রজাবর্গসহ নিম্নভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দূরারোহ আরাবল্লী পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বন্য ভীল-গণও এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। রাণা রাজসিংহ সমস্ত সৈন্য তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ লইয়া কুমার ভীমসিংহ আরাবল্লী পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বে রহিলেন, আর এক দল লইয়া কুমার জয়-সিংহ পর্ব্বতের উপর এমন এক স্থানে রহিলেন যে, পূর্ব্ব কি পশ্চিম যে দিক হইতে মোগল সৈন্য আসুক তাঁহাদের উপর পতিত হইতে পারিবে না। আর প্রধান সেনাদল সমভিব্যাবহারে রাণা স্বয়ং আরাবল্লী পর্ব্বত মধ্যস্থিত কয়েকটি গিরীপথের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আওরঙ্গজীব ক্রমে ক্রমে চিতোর, মণ্ডলগড়, মুণ্ডীসন প্রভৃতি দুর্গ অধিকার করিয়া নিজ পুত্র আকবরকে উদয়-পুর জয় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। পিতৃ আদেশে আকবর সসৈন্যে উদয়পুর অভিমুখে রওণা হইলেন।

কেহই তাহার গতিরোধ করিল না। আকবর বিনা যুদ্ধে জনশূন্য উদয়পুর অধিকার করিয়া আমোদে মত্ত হইলেন। সুবিধা বুঝিয়া হঠাৎ রাজকুমার জয়সিংহ তাহার উপর পতিত হইলেন। আকবর শত চেষ্টা করিয়াও সৈন্যগণকে স্থির করিতে পারিলেন না। মহাবীর জয়সিংহ বীরবিক্রমে তাহাদিগকে বিতাড়িত বিদলিত ও মথিত করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অসির আঘাতে অগণিত মোগল সৈন্য চির শান্তি লাভ করিল। অবশিষ্ট প্রাণভয়ে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; কিন্তু বহির্গমনের পথ না পাইয়া আর্য্যবীরগণের তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইতে লাগিল। রাজপুতগণের জয়ধ্বনি আরাবল্লী পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কুমার আকবর মহা বিপদে পতিত হইলেন। চারিদিকই শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই শত্রুর বিভিষিকা মূর্ত্তি তাহার নেত্রপথে পতিত হয়। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপদও ঘনিভূত হইয়া উঠিল। তাহাদের পানীয়ের অভাবে তাহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইল, দুর্দ্দশার পরিসামা রহিল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি জয়সিংহের করুণাপ্রার্থী হইলেন। দয়ার হৃদয় জয়-

সিংহ আকবরের অবস্থা দর্শনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি দান করিলেন।

আর একদল সৈন্য লইয়া মোগল বীরকেশরী দেলহীর খাঁ মারাবার হইতে দইশুরি গিরবর্ত্তের মধ্য দিয়া আকবরের সাহায্যার্থ গমন করিতেছিলেন। প্রবেশকালে কেহই তাহাকে বাধা প্রদান করেন নাই। কিন্তু যেমন তিনি গিরী পথের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি রূপনগরাধিপতি বিক্রম শেলাঙ্কী ওগনর নগরাধিপতি রাঠোর বীর গোপীনাথ তাঁহাকে মহা বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। অবিলম্বেই হিন্দু মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বিজয় লক্ষ্মী হিন্দুগণের প্রতি প্রসন্না হইলেন। হতভাগ্য দেলহীর খাঁ সদলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

উপযুক্ত সেনাপতি ও বীরপুত্রকে যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিয়া সম্রাট আওরঙ্গজেব যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্য দেবির গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। কুমার আকবর মহাবীর, সেনাপতি দেলহীর খাঁর বীরত্ব অতুলনীয়, সুতরাং অচিরেই তাঁহারা মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া সহাস্যবদনে ফিরিয়া আসিবেন, এইরূপ আশায় মুগ্ধ হইয়া সম্রাট নানারূপ সুখস্বপ্ন

দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বীর চূড়ামনি রাজপুত কুলতিলক রাজসিংহ অলক্ষিতে তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিলেন। অচিরেই উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাণা রাজসিংহের জ্বলন্ত উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া রাজপুতগণ যবন ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য দুর্গাদাসের জ্বলন্ত বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া রাঠোরবীরগণ, স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মনিষ্ঠ রাঠোর রাজ যশোবন্ত সিংহের হত্যার প্রতিশোধ নিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া ভীমরবে মোগল ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য ধাবিত হইতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব মুষ্টিমেয় রাজপুতগণের সাহস ও বীর্য্যবত্ত্বা দর্শনে ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার পাপ হৃদয় ভয়ে কম্পিত হইল। রাজপুতসৈন্য প্রতিহত করিবার জন্য তিনি সৈন্যদিগকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত রাজপুতগণকে অসুরবলে বলিয়ান যবনগণ বাধা প্রদানে সক্ষম হইল না। তাঁহারা যবন ব্যূহ ভেদ করিয়া মোগল সৈন্য দলিত ও মথিত করিতে লাগিলন। রাজপুত অসির আঘাতে অসংখ্য যবন সৈন্য চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া প্রাণভয়ে মোগলকুল কলঙ্ক সম্রাট আওরঙ্গজেব রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। মোগলদিগের

অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, ধ্বজা, ও অনেক অস্ত্রসস্ত্র রাজপুত-দিগের হস্তগত হইল।

এই মহা সমরে রাণা রাজসিংহ জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অনেক রাজপুত বীরের পতনে তাঁদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিল। ১৮৮০ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী এই লোকক্ষয়কর মহা সমর সংঘটিত হয়। পরাজিত হইয়াও সম্রাট নিরুদ্যম বা নিরুৎসাহ হইলেন না। শত্রুপক্ষকে প্রতিফল দিবার জন্য আবার পুনরুদ্যমে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। বীরকেশরী জয়মল্লের বংশধর সুবলদাসের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সুবলদাসের অপরিমেয় বীরত্বও সাহস দর্শনে সম্রাটের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল। পরিশেষে নিজ জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া সম্রাট কাপুরুষের মত যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতঃ পুত্র আকবর ও আজীমের হস্তে যুদ্ধভার ন্যস্ত করিয়া আজমীরে পলায়ন করেন।

পুনঃ পুনঃ জয়লাভে রাজপুতদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কুমার ভীমসিংহ—গুজরাট আক্রমণ করিলেন। দেওয়ান দয়ালশা রাণা রাজসিংহের আদেশে একদল সৈন্য নিয়া মালক আক্রমণ করিলেন। কেহই তাহার গতিরোধে সমর্থ হইল না। যবন কুলাঙ্গার আওরঙ্গ-

জেবের নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাঁহারা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া রাজপুতধর্ম্ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক নগর লুণ্ঠন ও নগরবাসি-গণের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজি-গণের হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক শশ্রুরাজি মুণ্ডন করিয়া দিলেন; এবং কোরানসরিফ কূপ বা অন্য কোন জালাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদিগের রোষাগ্নিতে মালব ও গুজরাট ভস্মিভূত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎপ্রদেশবাসিগণের তুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া রাণা রাজসিংহের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন। বিজয় উল্লাসে মত্ত হইয়া মহাতেজা দয়ালশা রাজকুমার জয়সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। কিছুতেই রণ পিপাসা নিবৃত্তি বা প্রতিহিংসায় শান্তি হইল না। তিনি জয়সিংহকে সমভিব্যাহারে সম্রাটের পুত্র আজিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অবিলম্বেই চিতোরের অনতিদূরে হিন্দু মুসলমানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবারও বিজয় লক্ষ্মী হিন্দুগণের বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের অঙ্ক শায়িনী হইলেন। আজিম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। এইরূপে মোগল সৈন্য মিবার ভূমি হইতে বিতাড়িত হইল।

আওরঙ্গেজেব মিবার হইতে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ও তাঁহার সমুচিত শিক্ষা লাভ হইল না। তিনি মারাবার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ কুমার অজিতের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক আবার যবন বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিলেন। রাজকুমার ভীমসিংহের অধিনায়কতায় আবার হিন্দু মুসলমানে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাজপুত বীরত্ব বহ্নিতে অসংখ্য মোগল সৈন্য পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল। বীরাগ্রগণ্য ভীমসিংহ বিজয় ডঙ্কা বাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

জীবন ব্যাপি মহা সংগ্রামের পর জয়সিংহের সর্ব্বাঙ্গ বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে লাগিল। শরীর দিন দিন অবসন্ন হইয়া আসিল, অচিরেই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমর ধামে প্রস্থান করিলেন। রাণা রাজসিংহ বীর কেশরী প্রতাপসিংহের উপযুক্ত বংশধর ছিলেন। ভারতের এই ঘোরতর তুর্দ্দিনে যদি এই মহা পুরুষের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দূজাতি ভারত হইতে চিরদিনের তরে লুপ্ত হইত। স্বদেশ প্রেমিক প্রতাপসিংহের মৃত্যুতে মিবারের যে

অভাব সংঘটিত হইয়াছিল অমরসিংহ কর্ণ বা জগৎসিংহ কেহই তাহা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু রাণা রাজসিংহ স্বীয় অলৌকিকী বুদ্ধিমত্তা ও মহা বিক্রমের গুণে সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। সামান্য জায়গীরদার হইয়া তিনি যে অপরিমেয় শক্তিশালী পাপের পূর্ণাবতার দুর্ব্বৃত্ত মোগল সম্রাটের গর্ব্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার—বীর্য্যবত্তার কথঞ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চিরজীবন মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখন ও তাঁহাকে অন্যায় ভাবে উৎপীড়ীত বা লাঞ্ছিত করেন নাই যে পাষাণ্ড সম্রাটের অত্যাচারে উৎপীড়িত হিন্দুগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে ভারত ভূমি প্রতিধ্বনিত হইত সেই পাষাণ্ডকে ও কত কতবার ক্ষমা করিয়া তিনি মহৎ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব কালে মিবারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। প্রজাবৎসল নরপতি রাজসিংহ প্রজাবর্গের দুঃখ মোচন করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেন। প্রজাবর্গের রক্ষনোদ্দেশ্যে তিনি রাজ সমুন্দ নামে একটি বিশাল হ্রদের প্রতিষ্ঠা করেন। রাণা রাজসিংহ লোক চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহার মহাপ্রাণতা

অপরিমেয় বীর্য বত্তা ও অসাধারণ কর্ত্তব্য নিষ্ঠা কখনও অন্তর্হিত হইবার নহে। যত দিন পর্য্যন্ত জগতে চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে যত দিন পর্য্যন্ত বীরত্ব অধ্যবশায় ও উদারতার আদর থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত রাণা রাজ-সিংহের নাম জগতে ঘোষিত হইবে।

"বন্দেমাতরম্"